ডঃ অতুল সুর

চৌদ্দ শতকের বাঙালী

চোদ্দ শতকের বাঙালী

চোদ্দ শতকের বাঙালী

ড. অতুল সুর

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা-৭

CHODDO SHATAKER BANGALI
(Bengal in B. S. 14th century)
By Dr. ATUL SUR

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৪০১
জুলাই, ১৯৯৪

Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market
Calcutta-7. INDIA

পরিবেশক ঃ
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর ঃ
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৬

ISBN—81-7334-039-0

পঁচিশ টাকা মাত্র

ভূমিকা

বইখানা সদ্যপ্রয়াত বঙ্গীয় চোদ্দ শতকের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। ওই শতকের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের সমাহার মাত্র। কিন্তু প্রবন্ধগুলো পড়লে পাঠক ওই শতাব্দীর একটা সার্বিক চিত্র পাবেন। সে সার্বিক চিত্র, পাঠক অধিকন্তু পাবেন বইখানার মুখপাতের প্রবন্ধ—'শতক বিহরণ'—এ। সেখানে গত ১০০ বছরের ইতিহাসের একটা কাকচক্ষু নিরীক্ষণ করা হয়েছে। ওই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে চোদ্দ শতকের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও ইংরেজের মহাপ্রস্থান। কি ভাবে সেটা ঘটল, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় প্রবন্ধে। আরও, শতাব্দী চিহ্নিত হয়ে আছে এক বাঙালী প্রত্নতত্ত্ববিদের বৈপ্লবিক আবিষ্কারে,—যা যুগ যুগ যাবৎ প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রমাণিত করল হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও তার শিকড় কোথায়। এটা আলোচিত হয়েছে বইখানার তৃতীয় প্রবন্ধে।

বিগত শতাব্দী সম্পূর্ণভাবে ওলট-পালট করে দিয়েছে আমাদের সমাজজীবন ও জীবনচর্যার ধারাকে। ওলট-পালটটা এমন ধরনের হয়েছে যে শতাব্দীর গোড়ার দিকের মানুষগুলোকে শতাব্দীর শেষের দিকের মানুষ থেকে চেনা যায় না। সমাজ জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে কৌলীন্য প্রথা ও বহু বিবাহের অবসানে, বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণে, বিয়ে বাড়ির রীতিনীতির পরিবর্তনে। সেজন্য এসব বিষয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ গ্রথিত হয়েছে।

এ শতাব্দীতে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান তাদের আগেকার যুগের সম্প্রীতি হারিয়েছে—যার প্রতিক্রিয়ায় ঘটেছিল নোয়াখালী ও কলকাতার মর্মন্তুদ দাঙ্গা, যার জেরে স্বাধীনতার শর্ত হিসাবে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু মন্দির-মসজিদ সমস্যা আজ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছে। বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ নানা উৎকট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু ভগবান ও আল্লার কৃপায় সুপরিকল্পিত যোজনাসমূহের দ্বারা সেগুলির সমাধান হয়েছে। এ সমস্ত বিষয় এ বইয়ের স্বতন্ত্র প্রবন্ধসমূহে আলোচিত হয়েছে।

শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশ ছিল বাঙালী জীবনের সুখময় যুগ। সস্তাগণ্ডার বাজারে দরিদ্রতা সত্ত্বেও বাঙালী হেসে খেলে তার নশ্বর জীবন কাটাতো। শেষের অর্ধ্যাংশে সে জর্জরিত হয়ে গিয়েছে মূল্যস্ফীতি, অবাঙালীর অবাধ আগমনে ও নানারূপ ক্লেশময় ঘটনায়। বাঙালী জীবন আজ সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত হয়েছে বধূ নির্যাতন ও নারীনিগ্রহে। সেজন্য এসব বিষয়েও প্রবন্ধ যোগ করা হয়েছে। এই নৈরাশ্যের মধ্যেও বাঙালী আজও পাচ্ছে 'অসকার' ও 'বিশ্বসুন্দরী' খেতাব। তবে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুলের যুগের আর পুনরাবির্ভাব ঘটেনি। সেজন্য কামনা করি যে বাঙালী সংকল্প করুক চরিত্রবান হয়ে তার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার।

১০ জুলাই ১৯৯৪ অতুল সুর

সূচী

শতক বিহরণ

কালের অনন্ত প্রবাহে একশ' বছর এক অতি সামান্য বিন্দুমাত্র। কিন্তু বঙ্গাব্দ চোদ্দ শতকের এই সামান্য সময়কালের মধ্যেই ঘটে গিয়েছে বৈপ্লবিক ঘটনাসমূহ যথা, দুই মহাযুদ্ধ, এক মন্বন্তর, স্বাধীনতা লাভ ও দেশ বিভাগ, গগনস্পর্শী মূল্যস্ফীতি, নৈতিক শৈথিল্য, মানবিক সত্তার অবনতি, নারী নির্যাতন-ধর্ষন ও বাঙালীর আত্মহনন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত থেকে ইংরেজের মহাপ্রস্থান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ। সেই ঘটনাই শতাব্দীর ইতিহাসকে বিভক্ত করে দুভাগে। সেই ঘটনা ঘটবার আগে আমরা কিরকম ছিলাম ও পরে কি হয়েছি, সেটাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

বঙ্গাব্দ ১৩০০-র আগের একশ' বছরে বাঙলায় ঘটে গিয়েছিল নব-জাগরণ বা রেনেসাঁ। যদিও রেনেসাঁর প্রধান হোতাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু ঘটেছিল ১২৮০ বঙ্গাব্দে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১২৯৮ বঙ্গাব্দে ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৩০০ বঙ্গাব্দে, তা হলেও তাঁদের তিরোধানের সঙ্গে রেনেসাঁর ধারা শুকিয়ে যায়নি। পূর্ণমাত্রায় চলেছিল সেই ধারা। দেশকে বড় ও মহৎ করাই ছিল রেনেসাঁর হোতাদের প্রধান লক্ষ্য। ১৩০০ বঙ্গাব্দেই আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে দেখি আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় ভারতীয় সংস্কৃতির মহান আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বজনের মন জয় করতে। ভারত সেদিন গর্বিত হল, যখন পড়ল 'নিউ ইয়র্ক হেরালড্'-এর স্তম্ভে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখিত প্রশস্তি—'ভারতের বাত্যাসৃজনী ঋষি ধর্ম-মহাসভার বৃহত্তম মানুষ।'

বস্তুত শতাব্দীর প্রথম পাদটা ছিল ভারতের এক অত্যাশ্চর্য ও আনন্দমুখর যুগ। মোহনবাগান জয় করল আই এফ এ শিলড। রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল পুরস্কার। শরৎচন্দ্র শুরু করলেন তাঁর অবিস্মরণীয় উপন্যাসসমূহ। আমেরিকায় গিয়ে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় পেলেন তাঁর 'গ্রে নেক' গ্রন্থের জন্য মার্কিন মুলুকের বিখ্যাত

পুরস্কার 'জন নিউবেরি পদক'। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঙালী দূর করল সাহেবদের দেওয়া অপবাদ যে বাঙালীর সামরিক শৌর্যবীর্য নেই। সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে এক দল বাঙালী বীর সেদিন বিশ্বকে চমৎকৃত করল। পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানদের গোলাবর্ষণের ব্যূহ ভেদ করে কেড়ে নিয়ে এল জার্মানদের কামানগুলো। বস্তুত, ধর্ম, ক্রীড়া, সাহিত্য, সামরিক শৌর্যবীর্য, সব ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হল বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব।

॥ দুই ॥

চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে বাঙালী সেদিন ছিল অদ্বিতীয়। গোপালকৃষ্ণ গোখলে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—'হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে, ইণ্ডিয়া থিংকস টুমরো।' গোপালকৃষ্ণ গোখলের এই উক্তির মধ্যে কোন অতিরঞ্জন ছিল না। আগের শতকে বাঙলাই ছিল নবজাগৃতির প্রসূতিগার। সব বিষয়ে বাঙালী ছিল এগিয়ে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে (১৩০০ বঙ্গাব্দ শুরু হয়েছিল ১৩ এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে) বোম্বাইয়ে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়, তখন তার সভাপতিত্ব করলেন একজন বাঙালী—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান নিযুক্ত হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহেবদের ইংরেজি লেখার ভুল ধরতে লাগলেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে।

চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমরা যেসব অনন্য-সাধারণ বাঙালীকে দেখি, তাঁদের মধ্যে জনাকয়েকের আমরা এখানে নাম করছি—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শিশির কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিনয়কুমার সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাসবিহারী ঘোষ, তারকচন্দ্র পালিত, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, যোগেশচন্দ্র রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, যদুনাথ সরকার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার ভাদুড়ি, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, ক্ষুদীরাম বসু, কানাইলাল দত্ত, সূর্য সেন, দীনেশচন্দ্র সেন,

সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এঁদের সমতুল কোন ব্যক্তিকে আর দেখি না। শতাব্দীর প্রথমার্ধের মানুষরা ছিলেন চিন্তাশীল ও প্রতিভাবান। চিন্তাশীলতাই ছিল তাঁদের মূলধন। দ্বিতীয়ার্ধের মানুষদের মূলধন হচ্ছে চালাকি। চালাকির দ্বারাই তাঁরা সবকিছু সমাধা করতে চান। প্রতিভার আজ আর কোন কদর নেই। যারা চালাকিতে ওস্তাদ, পাঁচজনের বই থেকে বিনা স্বীকৃতিতে উপাদান চুরি করে বই ছাপাতে জানে, তারাই আজকের চিন্তাশীল ও প্রতিভাবান পুরুষ। তারাই আজকের পণ্ডিতপ্রবর ও তারাই পায় সাম্মানিক ডি. লিট। সব দেখে শুনে বলতে ইচ্ছে করে—'ডক্টরেটস আর অ্যাওয়ার্ডেড বাই দ্য ফুলস ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য ফুলস্।'

।। তিন ।।

শতাব্দীর প্রথমার্ধটা ছিল অত্যন্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যুগ। জিনিস-পত্তরের দাম ছিল খুবই সস্তা। শতাব্দীর সূচনায় চালের দাম ছিল এক টাকা মন। তবে বঙ্গাব্দ প্রথম দশকের গোড়ার দিকে বুয়োর যুদ্ধের জন্য দাম বেড়ে দেড় টাকা থেকে দু'টাকা হয়েছিল। চল্লিশের দশকে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে গুণাগুণ অনুযায়ী) চালের দাম ছিল আড়াই টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা মন। অধিকাংশ ডালের দাম ছিল ছ' পয়সা সের। আটা দু' পয়সা সের, ময়দা চার পয়সা সের, সর্ষের তেল দশ পয়সা সের, চিনি দু' আনা সের, আর ভাল ভয়সা ঘি দশ আনা সের। মাখন আট আনা সের, মাংস ছ' আনা সের। বাগদা, ট্যাংরা, পারসে ইত্যাদি মাছ চার আনা সের। কাটা রুই মাছ ছ' আনা সের। দশ হাতি লাট্টু মার্কা ভাল বিলিতি কাপড় দেড় টাকা থেকে সাত সিকা জোড়া। এখনকার এক টাকা দামের রসগোল্লার নাম ছিল 'রসমুণ্ডি'। এক পয়সায় চারটে রসমুণ্ডি পাওয়া যেত। ফাউ চাইলে দোকানদার আরও একটা ফাউ দিত। আর বাকি সব রকম খাবার ছিল ছ' আনা সের। এসব দাম ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত (বঙ্গাব্দ শতকের

প্রথমার্ধ পর্যন্ত) চালু ছিল। তখনও কলকাতা শহরে 'পাইস হোটেল'-এর অস্তিত্ব ছিল। এসব হোটেলে এক পয়সার বিনিময়ে ভাত, ডাল, তরকারী, চাটনি পাওয়া যেত। কাপড়চোপড়ও ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আগেকার মতই ছিল। তবে তখন বিলিতি কাপড়ের পরিবর্তে এখানকার মিলের কাপড় পরার রীতি হয়েছিল। ৯২০-কাউণ্ট সুতোর মিহি ধুতির দাম ছিল সাত সিকে ও শাড়ীর দাম দু'টাকা চার আনা জোড়া। আর ধনেখালির উৎকৃষ্ট শাড়ী তিন টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকায় পাওয়া যেত।

ছেলেদের লেখাপড়ার খরচও ছিল খুব কম। স্কুলের মাইনে ছিল মাসিক এক আনা থেকে শুরু করে ম্যাট্রিকুলেশন (স্কুল ফাইনাল) ক্লাসে দু'টাকা। কলেজের মাইনে এক টাকা (ক্ষুদিরাম বাবুর সেনট্রাল কলেজে) থেকে শুরু করে পাঁচ টাকা (স্কটিশ চার্চ কলেজে)। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম. এ ক্লাসের মাইনে ছিল আট টাকা। পরীক্ষার ফি ছিল পনের থেকে পঁচিশ টাকা। আমার প্রথম বছরে লেখাপড়া করতে মোট খরচ হয়েছিল চোদ্দ আনা পয়সা—মাসিক এক আনা হিসাবে এক বৎসরের মাইনে বারো আনা, একখানা বর্ণপরিচয় দু'পয়সা, একখানা ধারাপাত দু' পয়সা, একখানা শ্লেট তিন পয়সা ও শ্লেট-পেনসিল এক পয়সা। আজকালকার মত বছরে বছরে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তিত হত না। একবার পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির বই কিনলে দু-চার পুরুষ তা পড়ত।

ডাক মাসুলের খরচাও খুব কম ছিল। পোস্টকার্ড এক পয়সা, খাম দু' পয়সা, রেজিস্ট্রেশন খরচ দু' আনা ও বিলেতে চিঠি পাঠাতে খরচ হত দশ পয়সা। পোস্ট আপিসের কর্মকুশলতা ছিল অদ্ভূত। আজ সকালে আটটার মধ্যে কলকাতা থেকে ব্যারাকপুরের ঠিকানায় চিঠি পোস্ট করলে, তা বেলা তিনটার সময় সেখানে বিলি হত, এবং সেখান থেকে তার জবাব পাঁচটার মধ্যে পোস্ট করলে কাল সকালে আটটার মধ্যে তা কলকাতায় বিলি হত। আর আজকের একটা নমুনা দিচ্ছি। একখানা চিঠি আমার নামে এবছর ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে লেনিন সরণী থেকে পোস্ট করা হয়েছে। ষোল আনা শুদ্ধ ঠিকানা থাকা সত্ত্বেও চিঠিখানা পেলাম ১০ এপ্রিল তারিখে।

॥ চার ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আবির্ভূত হল মহামন্বন্তর। যুদ্ধ দেশের দোরগোড়া পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার ফলে, সৈন্যবাহিনীকে খাওয়ানোর জন্য সরকার চাল 'কর্নার' করল। দেশে চাল দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অন্নাভাবে গ্রাম থেকে ভূমিহীন কৃষকের দল ছুটে এল রাজধানী শহরের দিকে। এখানে অনাহারে কলকাতার রাজপথে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল হাজার হাজার নরনারী ও শিশু। তারই পদাঙ্কে রেশনিং প্রথা চালু করা হল। সঙ্গে সঙ্গে চোরাবাজারীদের আবির্ভাব ঘটল। ফলে জিনিসপত্তরের দামের সামান্য কিছু হেরফের হতে লাগল। পণ্ডিত নেহরু তখন গদি পাননি। জিনিসপত্তরের মূল্যের উর্দ্ধগতি দেখে তিনি তো চটে লাল। উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন—'আমি যদি কোনদিন ক্ষমতায় আসি, তাহলে চোরাবাজারীদের ল্যাম্প-পোস্টে ঝুলিয়ে তাদের গলা কেটে দেব।' ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের পনের আগস্ট ভারত স্বাধীনতা পেল। পণ্ডিত নেহেরুই প্রধানমন্ত্রী হলেন। পনেরো আগস্টের মধ্যরাত্রে তিনি জাতির প্রতি ভাষণে বললেন, 'আমাদের দীর্ঘদিনের অধীনতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তার অনুবর্তী ঘটনাসমূহের ফলে, আমরা জীবনের অনেক পুঞ্জীভূত গুরুতর সমস্যার উত্তরাধিকারী হয়েছি। আজ আমাদের দেশের লোকের খাদ্য, বসন, ও নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাব রয়েছে। আমরা মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির নাগপাশে বদ্ধ হয়েছি। আমরা বিচক্ষণতার সঙ্গে এসব সমস্যার সমাধান করতে চাই, যাতে সাধারণ লোকের ক্লেশের বোঝা হ্রাস পায় ও তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।'

নেহরুর এই প্রতিশ্রুতি সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য ১৯৫১ সাল থেকে শুরু করে আমরা সাতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তিনটি বার্ষিক যোজনা ইতিমধ্যে রচিত ও রূপায়িত করেছি। বর্তমানে অষ্টম পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। সপ্তম পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত আমরা খরচ করেছি ৫৪৪,২৭৬ কোটি টাকা। অষ্টম পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৮৭২,১০০ কোটি টাকা। কিন্তু এই বিপুল অর্থব্যয় করেও আমরা দরিদ্র দেশবাসীর অদৃষ্ট ফেরাতে পারিনি। বরং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আমরা আরও দরিদ্র হয়ে পড়েছি। মূল্যস্ফীতি সাধারণ লোকের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছে। সরকার অবশ্য বলবেন যে আমরা অনেক

বিষয়ে এগিয়ে গেছি। কিন্তু সাধারণ লোকের জীবন যে আগেকার তুলনায় সুখময় হয়নি, সে সম্বন্ধে কোন বিতর্কই নেই। দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একই রব অনুরণিত হচ্ছে—'ম্যায় ভুখা হুঁ।' ধনী আরও বেশি ধনী হয়েছে, দরিদ্র হয়েছে দরিদ্রতর। মধ্যবিত্ত সমাজের অবলুপ্তি ঘটেছে।

॥ পাঁচ ॥

সবচেয়ে বড় দুর্গতি যা আজ মানুষকে অভিভূত করেছে তা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি। যারা মূল্যস্ফীতি ঘটাচ্ছে, নেহেরু তাদের ল্যাম্প-পোস্টে ঝুলিয়ে মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসবার পর দেখা গিয়েছিল যে তাদের সঙ্গেই তিনি হাত মিলিয়ে ফেলেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা সেই একই নীতি অনুসরণ করে এসেছেন, কেননা সেই ব্যবসায়ীদের বদান্যতার ওপরেই দলের পুষ্টি ও নির্বাচনের সাফল্য নির্ভর করে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের দোষ দিলে হবে না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকার নিজেও মূল্যস্ফীতি ঘটাচ্ছেন। প্রত্যক্ষভাবে সরকার মূল্যস্ফীতি ঘটাচ্ছেন পণ্যদ্রব্যেব ওপর কর বসিয়ে, রেলের মাসুল বাড়িয়ে ও পণ্যদ্রব্যের ঊর্ধ্বমূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে। আর পরোক্ষভাবে মূল্যস্ফীতি ঘটাচ্ছেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহের রূপায়নের জন্য ঘাটতি ব্যয়নীতি অনুসরণ করে। এ সবের ফলে বর্তমানে পণ্যদ্রব্যমূল্য এমন স্তরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে তুলনা করলে শতাব্দীর প্রথমার্ধের পণ্যদ্রব্যের মূল্যসমূহ রূপকথার কাহিনী বলে মনে হবে। নেহেরু পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দমন করে সাধারণ লোকের জীবন সুখময় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পণ্যমূল্য গগনস্পর্শী হয়ে সাধারণ লোকের জীবন কিরকম ক্লেশকর করেছে তা নীচে শতকের দুই অংশের পণ্যমূল্যের তালিকা থেকে প্রতীয়মান হবে।

পণ্যদ্রব্য	শতকের প্রথমার্ধের মূল্য	শতকের শেষের মূল্য
চাল (প্রতি মন)	দু' টাকা ৫০ পয়সা	৩২০ টাকা
ডাল (প্রতি সের)	ছ' পয়সা	২০ টাকা
সরষের তেল (প্রতি সের)	দশ পয়সা	৩০ টাকা
চিনি (প্রতি সের)	আট পয়সা	১৫ টাকা
ঘি (প্রতি সের)	দশ আনা	২০০ টাকা

মাংস (প্রতি সের)	ছ' আনা	৭২ টাকা
মাছ (কাটা রুই প্রতি সের)	ছ' আনা	৭০ টাকা
ধুতি (মিহি কাপড়)	দু' টাকা	৮০ টাকা
ধনেখালির শাড়ি	তিন টাকা	২৫০ টাকা

গত দশ বছরেই দ্রব্যমূল্য দ্বিগুন হয়ে গিয়েছে। এটা সরকারী 'কনস্যুমার প্রাইস ইনডেকস' থেকে বুঝতে পারা যাবে। ১৯৮২ সালে সূচকসংখ্যা ছিল ১০০, আর ১৯৯২-তে ২১৯। মূল্যস্ফীতি দেশের মধ্যে ধনবৈষম্য ঘটিয়েছে। ষাটের দশকে মহলানবীশ কমিটি এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সে সতর্কবাণীতে আমরা কর্ণপাত করিনি। ফলে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে ধনবৈষম্য বিরাট আকারে প্রকট হয়েছে।

॥ ছয় ॥

শতাব্দীর পূর্বাধের রাজনৈতিক পরিস্হিতি পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এবার শতাব্দীর শেষার্ধের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটার দিকে তাকানো যাক। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের শোচনীয় শর্ত হিসাবে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বপাকিস্তান। পশ্চিমবঙ্গ জন্মগ্রহণ করেছিল অনেক সমস্যা নিয়ে। যুক্তবাঙলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ছিল একটা ভারসাম্য। পূর্ববাঙলা ছিল কৃষিপ্রধান, সেজন্য পূর্ববাঙলা ছিল খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের আড়ত। আর পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিল্প প্রধান। পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যশস্য ও কাঁচা-মালের জন্য পূর্ববাঙলার ওপর নির্ভর করতে হত। দ্বিখন্ডিত হবার পর এই আর্থিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ে। তারপর পশ্চিমবঙ্গ ছিল ঘনবসতিবহুল অংশ। তার মানে, আগে থেকেই এখানে ছিল বাসস্থানের অভাব। সে অভাবকে ক্রমশই তীব্রতর করে তুলেছিল অন্য প্রদেশ থেকে আগত জনসমুদ্র। এই সমস্যাকে আরও উৎকট করে তুলল যখন নিরাপত্তার কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পূর্ববাঙলা থেকে পশ্চিমবাঙলায় এল।

যখন পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হল, তখন প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে এক 'ছায়া মন্ত্রি পরিষদ' রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করল। কিন্তু চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই সেই মন্ত্রিসভা ভেঙে পড়ল। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি

মাসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। স্বাভাবিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গ যেসব উৎকট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, সেগুলির সমাধান এই নতুন মন্ত্রিসভার ঘাড়ে চেপে বসল। নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাঁর মৃতুকাল পর্যন্ত আঠারো বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলি একে একে সমাধান করে ফেললেন।

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ১ জুলাই বিধান রায়ের মৃত্যুর পর কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু তাঁর অনুসৃত খাদ্য-নীতি জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ায়, ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন ও অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে এক যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এক নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তা-ও স্বল্পকালস্থায়ী হওয়ায় ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অজয় মুখার্জি'র নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। মাত্র এক বছরের বেশি এ-সরকার স্হায়ী হয় না। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ মার্চ আবার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অজয় মুখার্জি'র নেতৃত্বে এক ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কিন্তু দু'মাস পরে (জুন ১৯৭১) তা ভেঙে পড়ে। তখন (৩০ জুন ১৯৭১) আবার রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়। ১৯৭২-এর মার্চ মাসে সিদ্ধার্থশংকর রায়েয় নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে 'বামফ্রন্ট' দল সাফল্য অর্জন করাতে জ্যোতি বসু 'বামফ্রন্ট সরকার' গঠন করেন। এই বামফ্রন্ট সরকারই এখনও পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আছে।

বৈষয়িক সম্পদ বৃদ্ধির অন্তরালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ঘটেছে শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি, রাজনৈতিক দলাদলি, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও নির্যাতন, মধ্যবিত্ত সমাজের অবলুপ্তি, শিক্ষার সংকট, বাঙলায় অবাঙালীর অবারিত আগমন ও কর্মসংস্থানের ওপর তার প্রতিঘাত, বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা ও নৈতিক শৈথিল্য। তাছাড়া বাঙালীর মানবিক সত্তা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। নারীনিগ্রহ ও বধূ-নির্যাতনের ক্রমবৃদ্ধিহার তার দৃষ্টান্ত।

বস্তুত, সমকালীন সামাজিক বিশৃঙ্খলতা, মানবিক সত্তার হ্রাস ও নৈতিক শৈথিল্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে

বাঙালীর জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা অবক্ষয়ের পথে চলেছে কিনা? অশন-বসনে, আচার-ব্যবহারে বাঙালী আজ যেমন নিজেকে বহুরূপী করে তুলেছে, তেমনই বর্ণচোরা করেছে তার সংস্কৃতিকে। অতীতের গৌরবময় সংস্কৃতির পরিবর্তে এক জারজ সংস্কৃতির প্রাবল্যই লক্ষিত হচ্ছে।

॥ সাত ॥

এরই মধ্যে ঘটে গিয়েছে বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য অগ্রগতি। আগের শতকে আমরা পেয়েছিলাম টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীতে আমরা পেয়েছি বেতার, বিমান, খনিজতৈল, মোটরগাড়ি, পরমাণুর ব্যবহার, ইলেকট্রনিকস্, টেলিভিসন, প্লাস্টিকস্ ইত্যাদি। বস্তুত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এমনভাবে এগিয়ে গেছি যে মনে হবে বিজ্ঞানই বুঝি বা স্বয়ং ভগবান। ভগবানের দুই সত্ত্বা আছে—তিনি যুগপৎ স্রষ্টা ও সংহারকর্তা। বিজ্ঞানও তাই। বিজ্ঞান যেমন একদিকে মানুষের কল্যাণ সাধন করছে, অপরদিকে মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। জানিনা আগামীকালে মানুষের কপালে কি আছে। কেননা এখন চলেছে প্রকৃতির ওপর আধিপত্যের জন্য বিজ্ঞানের লড়াই। এই বিজ্ঞান বনাম প্রকৃতির লড়াইয়ের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে, হয় মানবসভ্যতার আরও অগ্রগতি, আর তা নয়তো মানুষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। (অতুল সুর, 'মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' দ্রঃ)

বিপ্লববাদী সমাজের অভ্যুত্থান

বিগত শতকের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত থেকে ইংরেজের মহাপ্রস্থান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ। সেটা কি করে ঘটেছিল, সেটাই এখানে বলছি।

যদিও স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দেই 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল, তা হলেও ওটা বিপ্লববাদী সংস্থা ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের পূর্বে সংঘটিত যে সব ঘটনাকে আমরা স্বাধীনতা লাভের পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করি সেগুলো বিপ্লব নয়, বিদ্রোহ মাত্র। প্রকৃত বিপ্লববাদের আগুন জ্বলে ওঠে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে। বঙ্গদেশের আয়তন এককালে অনেক বড় ছিল। কিন্তু তাকে ছোট করে আনা হয়েছিল বঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িষা ও ছোটনাগপুরে। তারপর আসাম প্রদেশকে পৃথক করে একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়। মোট কথা নানারকম রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গদেশকে খর্ব করবার অপচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার প্রস্তাব করেন যে বঙ্গদেশকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করা হউক। প্রস্তাবটা বঙ্গদেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এমন কি ইংরেজ মালিকানাবিশিষ্ট ও ইংরেজ কর্তৃক সম্পাদিত 'ইংলিশম্যান' পত্রিকাতেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লেখা হয়। কিন্তু এসব সত্বেও ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অকটোবর তারিখে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হয়। পূর্বদিকে সৃষ্ট হল আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশ ও পশ্চিমে বাকি অংশ। চতুর্দিকে বিদ্বেষের বহ্নি জ্বলে উঠল। বিলাতী পণ্য বর্জন করা হল। যারা বিলাতী জিনিষের দোকানে পিকেটিং করল, তাদের ওপর পুলিশ নিষ্ঠুর অত্যাচার করল। এর প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ পেল।

আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হল জাতীয়তাবাদ, আর জাতীয়তাবাদ এক শ্রেণীর মধ্যে বীজ বপন করল বিপ্লববাদের। বিপ্লববাদ প্রসারের জন্য প্রথম যে সমিতি গঠিত হল, তা হচ্ছে অনুশীলন সমিতি। এর শাখা প্রশাখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত হল এক সশস্ত্র বিপ্লবীদল। তারা তাদের গোপন

কেন্দ্র করল মানিকতলার খালের ওপারে মুরারীপুকুরে এক নিভৃত বাগানবাড়িতে। বারীন্দ্রের নেতৃত্বে যে দল গঠিত হল, তারা দু'জন সদস্যকে বিদেশে পাঠাল বোমা তৈরী করবার প্রণালী শিখে আসবার জন্য। তারপর মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িতে বোমা তৈরির আয়োজন চলতে লাগল। বারীন্দ্রের দলের দুজন প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু মজফরপুরের দিকে রওনা হল কলকাতার প্রাক্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার জন্য। ভুল করে তারা কিংসফোর্ডের গাড়ির মত দেখতে অন্য একখানা গাড়ির ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। নিহত হয় মিস্টার কেনেডি নামে এক আইনবিদের স্ত্রী ও কন্যা। প্রফুল্ল ধৃত হয় বটে কিন্তু সে আত্মঘাতী হয়। ক্ষুদিরামের বিচার হয় এবং তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

এরপর আসে বিশ্বাসঘাতকের পালা। নরেন্দ্র গোস্বামী নামে দলের একজন সদস্য পুলিসের কাছে গোপন তথ্য সরবরাহ করে বারীন্দ্রের দলকে ধরিয়ে দিয়েছিল। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু নামে দলের দু'জন বন্দী জেলখানার মধ্যেই নরেন্দ্রকে হত্যা করে। বিচারে বারীন্দ্র সমেত ১৪ জন অপরাধী সাব্যস্ত হয়। তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু এই সঙ্গে বিপ্লববাদের পরিসমাপ্তি ঘটে না। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ন্যূনাধিক ৬৩ জন নিহত হয়। সংগ্রামের জন্য অর্থ-সংগ্রহের প্রয়াসে বিপ্লবীদল রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করে। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ১১২টা ডাকাতি হয় এবং ডাকাতরা এভাবে সাত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে।

॥ দুই ॥

বিপ্লবের জন্য বিদেশে হরদয়ালের নেতৃত্বে এক দল গঠিত হয়। এই দল বিদেশ থেকে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করে। অস্ত্রশস্ত্র আসছে, এই খবর পেয়ে সেগুলো কোন নিভৃত স্থানে নামাবার জন্য যাদু-গোপাল মুখুজ্যে যান সুন্দরবনে ও যতীন মুখুজ্যে যান বালেশ্বরে। বালেশ্বরে যতীন মুখুজ্যের কাছে বাটাভিয়ায় অবস্থিত সহানুভূতিশীল জারমান সরকারের প্রতিভূরা বিপ্লবে সাহায্য করবার জন্য টাকা পাঠাতে থাকে। কিন্তু শেষ কিস্তির দশ হাজার টাকা ব্রিটিশ সরকারের হাতে গিয়ে পড়ে। সেই সূত্র ধরে পুলিস যতীন মুখুজ্যের তল্লাসে বেরিয়ে

পড়ে। বুড়িবালামের তীরে যতীন মুখুজ্যে ও তার সহকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। পুলিশের সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে যতীন মুখুজ্যে লড়ে যান। তিনি আহত হন। আহত অবস্থায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এদিকে রাসবিহারী বসু ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। বিদ্রোহের দিন নির্দিষ্ট হয় ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে। কিন্তু রাসবিহারীর দলে কিরপাল সিং নামে পুলিশের একজন গুপ্তচর যোগদান করে। তার মারফত সরকার আগে থাকতেই খবর পেয়ে এ চেষ্টা বিফল করে দেয়।

॥ তিন ॥

রাউলাট আইন ও জালিওয়ানাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পদাঙ্কে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে গান্ধীজী হন ভারতীয় কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পথ ঘোষণা করেন। কিন্তু বিধানসভার মাধ্যমে স্বরাজ লাভের আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গঠিত করলেন 'স্বরাজ্য পার্টি"। তাঁরা বিধানসভার মধ্যে নানাভাবে সরকারকে বিপর্যস্ত করে তোলেন।

এর মধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী দলের প্রাদুর্ভাব ঘটল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হল। বিনয়, বাদল, দীনেশ রাইটার্স বিলডিং-এর অভ্যন্তরে সিম্পসন সাহেবকে হত্যা করল। ঢাকায় পুলিশ সুপারিন-টেনডেণ্ট লোম্যান সাহেবও নিহত হল।

আইন অমান্য করে লবণ প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করলেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে লোক কারারুদ্ধ হল।

॥ চার ॥

তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কংগ্রেস প্রথমে যুদ্ধে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু সরকার তাতে সাড়া না দেওয়ায় ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হল। সেদিন সমস্ত দেশবাসী আত্মবলে বলীয়ান হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—'করেংগে ইয়া মরেংগে।'

সরকার নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করল। বিক্ষুব্ধ দেশবাসী সংগ্রাম শুরু করল ইংরেজের বিরুদ্ধে। 'আগস্ট বিপ্লব' নামে আখ্যাত এই সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করল মেদিনীপুর জেলায়। সতীশচন্দ্র সামন্তের অধিনায়কত্বে বিপ্লবীরা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করল এক স্বাধীন সরকার। প্রায় দেড় বৎসর ইংরেজ শাসন সেখানে বিলুপ্ত হল। ইংরেজ চালালো অমানুষিক অত্যাচার ও ব্যাপক নারীধর্ষণ, পুলিশের গুলি অগ্রাহ্য করে অপূর্ব দেশপ্রেম ও সাহস দেখাল মাতঙ্গিনী হাজরা। সত্তর বৎসর বয়স্কা এই বীরাঙ্গনা মহিলা ললাটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে মৃত্যুবরণ করল। বাঙলার সর্বত্রই চলল উত্তেজনা ও পুলিশের অকথ্য অত্যাচার।

ইতিমধ্যে লড়াইয়ের মধ্যেই ঘটে গেল এক চমকপ্রদ ঘটনা। 'আগস্ট বিপ্লব'-এর সময় সুভাষ চন্দ্র বসুকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তাঁকে জেলখানা থেকে এনে নিজগৃহে অন্তরীণ করা হল। কিন্তু ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি অন্তর্হিত হলেন ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারী তারিখে। আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে তিনি গিয়ে পেঁছালেন জারমানীতে। সেখান থেকে জাপানে গিয়ে তিনি গঠন করলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। জাপানী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজ আক্রমণ হানল ব্রহ্মদেশের ওপর। তাসের বাড়ির মত টলমল করে পড়ে যেতে লাগল শহরের পর শহর ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহ। নেতাজী এসে উপনীত হলেন আসাম সীমান্তে। ধ্বনি তুললেন—'দিল্লী চল', 'লালকেল্লায় গিয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা তোল।' কিন্তু যুদ্ধের পর নেতাজী আবার হলেন অদৃশ্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে। যুদ্ধে জয়লাভ করলে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে, এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইংরেজ। কিন্তু স্বাধীনতার ব্যাপার নিয়ে বিবাদ বাঁধল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে এল ক্যাবিনেট মিশন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মীমাংসা করবার জন্য। কিন্তু মীমাংসার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ওরই পদাঙ্কে লাগল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা। নোয়াখালি ও পূর্ববঙ্গের অন্যত্র দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করল। কল-কাতাতে দাঙ্গার হাঙ্গামা তুঙ্গে উঠল। ওই দাঙ্গার পদাঙ্কেই দেশ-বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ ঘটল।

হিন্দু সভ্যতার শিকর আবিষ্কার

হিন্দু সভ্যতার ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দী চিহ্নিত হয়ে আছে এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের জন্য। সেটা হচ্ছে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের পূর্বে পণ্ডিতমহলের বিশ্বাস ছিল যে আগন্তুক আর্যরাই ভারতীয় সভ্যতার স্রষ্টা। তাঁরা মনে করতেন যে খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যরা পঞ্চনদের উপত্যকায় আসবার পূর্বে, ভারতের লোকরা ছিল অসভ্য ও বর্বর এবং আর্যরাই তাদের সভ্য করে তুলেছিল। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার এক লহমায় প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ওই ধারণা একেবারেই ভুল। আর্যরা এদেশে আসবার হাজার বৎসর পূর্বেই এদেশে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল এক শিক্ষিত নগর সভ্যতা, যার বাহকরা আর্যদের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য ছিল। বরং বলা যেতে পারে যে সিন্ধু সভ্যতার বাহকদের তুলনায়, আর্যরাই ছিল এক বর্বর জাতি।

সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রত্যক্ষ। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা অধিকরণের সর্বময় কর্তা স্যার জন মারশাল আমাকে নিয়োজিত করেন 'হিন্দু-সভ্যতার গঠনে সিন্ধু সভ্যতার অবদান' সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য। এই গবেষণার কাজটা দু পর্যায়ে সমাপ্ত হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে মহেঞ্জোদারোয় ও দ্বিতীয় পর্যায়ে কলকাতায়। প্রথম পর্যায়ে আমি যখন মহেঞ্জোদারোতে সরেজমিনে গবেষণা চালাচ্ছি, তখন এক বাঙালী-বিদ্বেষী অফিসারের হাতে নিপীড়িত হবার ভয়ে আমাকে কলকাতাতে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। সে কথাটা যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের প্রেসিডেন্ট ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও সেনেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কানে গেল, তখন তাঁরা আমাকে বৈতনিক গবেষক নিযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুশীলন চালিয়ে যেতে বললেন।' দু বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুশীলন চালিয়ে এই তথ্য উত্থাপন করলাম যে হিন্দু সভ্যতার গঠনের মূলে বারো-আনা ভাগ আছে সিন্ধু উপত্যকার প্রাক্-আর্য সভ্যতা; আর মাত্র চার-আনা ভাগ মণ্ডিত আর্য সভ্যতার আবরণে। আমার গবেষণা-লব্ধ তথ্যসমূহ আমি স্যার জন মারশালের কাছে পাঠাতাম। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিশদ প্রতিবেদন

পেশ করতাম। আমার সতীর্থ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি আমার গবেষণা সম্পর্কিত প্রতিবেদনের অংশবিশেষ ওই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিছু অংশ 'ইণ্ডিয়ান হিসটরিক্যাল কোয়াটারলি' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ইণ্ডিয়ান কালচারেল কনফারেনসে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণে বললেন—'হিন্দু সভ্যতা যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে উদ্ভূত এটা যে চারজন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন স্যার জন মারশাল, রায়-বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর।'

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। ভারতের ইতিহাসের ওপর প্রাক্-বৈদিক সভ্যতার প্রভাব যে কতখানি, তা আমাদের ঐতিহাসিকরা বুঝলেন না। গতানুগতিক ভাবে ভারতের ইতিহাস রচিত হতে লাগল, মাত্র বৈদিক যুগের আগে সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে একটা অধ্যায় যোগ করে দিয়ে।

আমি যখন মহেঞ্জোদারোয় যাই, তখন নগরীর যে অঞ্চলে খননকার্য চলছিল, তার নামকরণ করা হয়েছিল ঃ DK Area—Intermediate III period। মহেঞ্জোদারোর প্রশস্ত রাজপথ ও সমান্তরাল রাস্তাগুলি সে বৎসরই আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রশস্ত রাজপথটি উত্তর-দক্ষিণমুখী। রাজপথটি তখন মাত্র এক কিলোমিটার পর্যন্ত খুঁড়ে বের করা হয়েছে। রাজপথটি ৩১ থেকে ৩৬ ফুট প্রশস্ত, আর সমান্তরাল পথগুলি ২০ থেকে ২৫ ফুট। সে বৎসর আরও আবিষ্কৃত হয়েছিল নগরীর পয়ঃপ্রণালী। পোড়া ইট দিয়ে তৈরী এই পয়ঃপ্রণালী অনেকটা পথ রাস্তার পশ্চিম ধার দিয়ে এসে, এক জায়গায় রাস্তা অতিক্রম করে, রাস্তার পূর্ব পাশ ধরে চলে গিয়েছিল। বাড়ির দূষিত জল এই পয়ঃপ্রণালীতে এসে পড়ত, তবে অনেক বাড়িতে 'সোক্‌পিট'ও ছিল। প্রতি বাড়ির প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকলেই সামনে পড়ত বাড়ির প্রাঙ্গণ। প্রবেশ পথের নিকট প্রাঙ্গণের এক পাশে থাকত বাড়ির কূপ। স্নানের সময় আবরু রক্ষার জন্য কূপগুলিকে দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত করা হত। রাজপথের দিকে বাড়ির যে দোকান-ঘরগুলি ছিল, তার অনেকগুলির সামনে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম

ইটের গাঁথা পাটাতন। বোধহয় এই পাটাতনগুলির ওপর বিক্রেতারা দিনের বেলা তাদের পণ্যসম্ভার সাজিয়ে রাখত, এবং রাত্রিকালে সেগুলিকে দোকান-ঘরে তুলে রাখত। ছোট ছোট যে সব দ্রব্যসামগ্রী আমরা সে বৎসর পেয়েছিলাম, তার মধ্যে ছিল মেয়েদের মাথার কাঁটা। তা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করেছিলাম যে, মেয়েরা খোঁপা বাঁধত ও খোঁপায় কাঁটা গুঁজত। তবে মেয়েরা যে বেণী ঝুলিয়েও ঘুরে বেড়াত, তার প্রমাণও আমরা পেয়েছিলাম।

ব্যাপকভাবে খননকার্যের ফলে এখন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো ছাড়া তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার আরও অনেক কেন্দ্র খুঁজে বের করা হয়েছে। এর ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে এই সভ্যতার বিকাশ পনেরো লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী এক বিস্তৃত এলাকায় ঘটেছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে দেশ-বিভাগের পর এই সকল কেন্দ্রের কিছু পাকিস্তানে ও কিছু ভারতের মধ্যে পড়েছে। সিন্ধু সভ্যতার যেসব কেন্দ্র ভারতের মধ্যে পড়েছে সেগুলি হচ্ছে—কালিবঙ্গান, লোথাল, রুপার, চণ্ডীগড়, সুরকোটড়া, দেশলপুর, নাবিনাল, রঙপুর, ভগৎরাও, মাণ্ড, বরা, বরগাওন, বাহাদারাবাদ, শিশওয়াল, মিটাথাল, আলমগিরপুর, কায়াথা, গিলাণ্ড, টড়িও, দ্বারকা, কিনডারখেদ, প্রভাস, মাটিয়ালা, মোটা, রোজড়ি, আমরাফলা, জেকডা, সুজনপুর, কানাসুতারিয়া, মেহগাওন, কাপড়খেদা ও সবলদা। এছাড়া তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতার নিদর্শন আমরা পেয়েছি—লালকিলা, নোয়া, মানোটি, দৈমাবাদ, মহিষদল, বানেশ্বরডাঙ্গা, পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি স্থান থেকেও। ১৯২৯-৩১ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈতনিক গবেষক হিসাবে সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে অনুশীলন করেছিলাম, তখন আমার প্রতিবেদনের প্রথম অনুচ্ছেদেই বলেছিলাম—"এ সম্পর্কে ঝুঁকি নিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে পরবর্তীকালে অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন গঙ্গা উপত্যকাতেও পাওয়া যেতে পারে, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে এ সভ্যতা উত্তর ও প্রাচ্য ভারতেও বিস্তার লাভ করেছিল।" আজ খননকার্যের ফলে আমার সেই অনুমান বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

॥ দুই ॥

অনেকেই বলেন যে সিন্ধুসভ্যতা ও আর্যসভ্যতা অভিন্ন। কিন্তু

এটা যে ভ্রান্ত মত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দুই সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই এটা বুঝতে পারা যাবে। দুই সভ্যতার মূলগত পার্থক্যগুলি আমি নীচে দিচ্ছি—

(১) সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা শিশ্ন-উপাসক ছিল মাতৃকাদেবীর আরাধনা করত। আর্যরা শিশ্ন-উপাসক ছিল না ও শিশ্ন-উপাসকদের ঘৃণা ও নিন্দা করত। আর্যরা পুরুষ দেবতার উপাসক ছিল। মাতৃকা-দেবীর পূজার কোন আভাসই আমরা ঋগ্বেদে পাই না।

(২) আর্যরাই প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল। ঘোড়াই ছিল তাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জন্তু। এখানে বলা দরকার যে ঘোড়ার কোন অশ্মীভূত (fossilized) অস্থি আমরা সিন্ধুসভ্যতার কোন কেন্দ্রে পাইনি। সিন্ধুসভ্যতার বাহকদের কাছে বলীবর্দই প্রধান জন্তু ছিল। এটা শীলমোহরসমূহের ওপর পুনঃ পুনঃ বলীবর্দের প্রতিকৃতি খোদন থেকে বুঝতে পারা যায়। পশুপতি শিব আরাধনার প্রমাণও মহেঞ্জো-দারো থেকে পাওয়া গিয়েছে। বলীবর্দ শিবেরই বাহন। সুতরাং সিন্ধু-সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে বলীবর্দের প্রাধান্য সহজেই অনুমেয়।

(৩) সিন্ধুসভ্যতার বাহকরা নগরবাসী ছিল। আর্যরা নগর নির্মাণ করত না। তারা নগর ধ্বংস করত। সেজন্য তারা তাদের দেবতা ইন্দ্রের নাম পুরন্দর রেখেছিল।

(৪) আর্যরা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করত। সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা মৃতকে সমাধিস্থ করত।

(৫) আর্যদের মধ্যে লিখন প্রণালীর প্রচলন ছিল না। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের মধ্যে লিখন প্রণালী সুপ্রচলিত ছিল।

(৬) সিন্ধুসভ্যতা যে আর্যসভ্যতা নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে মৃৎপাত্র। কুরু-পাঞ্চাল দেশ, তার মানে যেখানে আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল, সেখানকার বৈশিষ্ট্যমূলক মৃৎপাত্রের রঙ ছিল ধূসর বর্ণ। সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্র সমূহ থেকে যে সব মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলির রঙ হচ্ছে 'কালো-লাল'।

(৭) সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। আর্যরা প্রথমে কৃষিকার্য জানত না। এটা আমরা শতপথব্রাহ্মণের এক উক্তি থেকে জানতে পারি। (এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য আমার 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' দ্রষ্টব্য।)

(৮) সিন্ধুসভ্যতার লোকেরা হাতির সঙ্গে বেশ সুপরিচিত ছিল। আর্যদের কাছে হাতি এক নতুন জীববিশেষ ছিল। সেজন্য তারা হাতিকে 'হস্তবিশিষ্ট মৃগ' বলে অভিহিত করত। বস্তুতঃ হাতিকে প্রাচ্য ভারতের পালকপ্য নামে এক ঋষিই প্রথম পোষ মানিয়েছিল।

এসব প্রমাণ থেকে সহজেই বুঝা যাবে যে আর্যসভ্যতা ও সিন্ধু-সভ্যতা এক নয়।

গোড়ার দিকে আর্যরা সিন্ধুসভ্যতার বাহকদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম চালিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই গোড়ার দিকের বৈরিতা পরবর্তীকালে আর স্থায়ী হয়নি। পঞ্চনদ থেকে তারা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হল, ততই তারা এদেশের লোকের সংস্পর্শে এল। তারা এদেশের মেয়েদেরও বিয়ে করল। যখন অনার্য রমণী গৃহিণী হল, তখন আর্যদের ধর্মকর্মের ওপর তার প্রতিঘাত পড়ল। ক্রমশঃ তারা বৈদিক যজ্ঞাদি ও বৈদিক দেবতাগণকে পশ্চাদভূমিতে অপসারণ করল। আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণে পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীর সৃষ্টি হল।

আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশ্লেষ ঘটেছিল সেখানে, যেটাকে আগে আমরা 'কুরু-পাঞ্চাল' দেশ বলতাম বা গঙ্গা ও যমুনার অন্তবর্তী অঞ্চল। সেখানে আর্যদের আপোষ করতে হয়েছিল অনার্যদের ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে। এটা বিবর্তনের ক্রমিক ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল পৌরাণিক যুগে। এই সংশ্লেষণের পর আমরা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখি, যেটা বৈদিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। লোকে আর ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার স্তুতি-গান করে না। বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করে না। নতুন দেবতামণ্ডলীর পত্তন ঘটে। যজ্ঞের পরিবর্তে আসে পূজা ও উপাসনা। বৈদিক আত্মকেন্দ্রিক স্তুতিগানের পরিবর্তে আসে ভক্তি। এর ওপর প্রাগার্য তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে। বৈদিক যুগের আর্যরা যাদের ঘৃণার চক্ষে দেখতেন ও যাদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতেন, শেষ পর্যন্ত সেই অনার্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহেরই জয় হল। বেদ সংকলন ও মহাভারত পুরাণ ইত্যাদি রচনার ভার ন্যস্ত হল এক অনার্য রমণীর জারজ সন্তানের ওপর! এ সবই আমরা বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের আবিষ্কার ও অনু-শীলনের ফলে জানতে পেরেছি।

কুলীনের মেয়ের মুক্তি

বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতাব্দী স্মরণীয় হয়ে আছে কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে বহুবিবাহ নিরোধের জন্য। মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ কলঙ্কিত হয়েছিল এই অপপ্রথার জন্য।

আগের শতাব্দীতে কৌলীন্য প্রথা নিরোধের জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়েছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যদিও বিধবা বিবাহ বৈধ করবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল (১৮৫৬ সালের ১৫ নম্বর আইন দ্বারা), কিন্তু কৌলীন্য প্রথা নিরোধের জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ফলবতী" হয়নি। সরকার এ সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়ন করেন নি। সরকার কর্তৃক প্রণীত না হলেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টার ফলে যে জনমত গড়ে ওঠে তারই প্রভাবে বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতাব্দীতে কৌলীন্য প্রথার অবলুপ্তি ঘটে।

কুলীনের মেয়ের ছিল অভিশপ্ত ও কলঙ্কিত জীবন। 'কুলীনের মেয়ে' বলতে বোঝাত কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা। যে সকল ব্রাহ্মণ 'কুলীন' নামে আখ্যাত হতেন, তাঁদের পদবী ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়। সামাজিক মর্যাদায় তাঁরা ছিলেন অন্যান্য ব্রাহ্মণের তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। বিবাহ সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে যে বিধান প্রচলিত ছিল সেই বিধান অনুযায়ী কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান কুলীন বা অকুলীন ব্রাহ্মণ বংশে বিবাহ করতে পারত, কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণকন্যারা তা পারত না। যদি সেরূপ মেয়ের বিবাহ অকুলীনের সঙ্গে হতো, তাহলে তার বাবার কৌলীন্য ভঙ্গ হতো। সামাজিক মর্যাদায় সেরূপ বংশ হীন বলে পরিগণিত হতো। সেজন্য কুলীন ব্রাহ্মণরা কন্যাদান কুলীন পাত্রেই করত। এছাড়া আরও বিধিনিষেধ ছিল। ফলে কুলীন কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে সমাজে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

বস্তুত মধ্যযুগের বাঙালী ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলীন্য প্রথা যে জটিল

অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তাতে কুলীন কন্যাদের বিবাহ যে মাত্র দুষ্কর হয়ে উঠেছিল তা নয় ; বিভ্রাটে ও সামাজিক অশুচিতায় পরিণত হয়েছিল। অর্থগৃধ্নুতা একশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণকে প্রলুব্ধ করেছিল 'বিবাহ'কে একটা বাণিজ্যিক পেশায় পরিণত করতে। রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে তাদের 'বিবাহ বণিক' বলে বর্ণনা করেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে অর্থের বিনিময়ে তারা কুলীন কন্যার পিতাদের কন্যাদায় হতে মুক্ত করত। তারপর বিবাহান্তে ওই সকল বিবাহবণিক নিজেদের খাতায় কন্যার ও তার পিতার নামধাম লিখে নিয়ে অন্তর্হিত হতো। ফলে সেরূপ 'বিবাহিতা' কুলীন কন্যাকে পিতৃগৃহেই থাকতে হতো। অনেক সময় কুলীন পিতা কুলরক্ষার জন্য শ্মশানঘাটে 'গঙ্গাজলী'র জন্য আনীত কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিতেন। অচিরেই সেই কন্যা বিধবা হতো। এরূপ বিধবা কুলীন কন্যারাও পিতৃগৃহেই থেকে যেত। আবার গরীব কুলীন কন্যাদের অনেক সময় বিবাহই হতো না। সারা জীবন তাদের অনূঢ়া হয়েই পিতৃগৃহে থেকে যেতে হতো।

যারা কুলীন কন্যাদের বিবাহ করা পেশা রূপে গ্রহণ করেছিল, সে-সব কুলীন ব্রাহ্মণ খাতা দেখে নামধাম সংগ্রহ করে মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করত এবং এক রাত্রি জামাই আদরে থেকে সালিয়ানা দক্ষিণা আদায় করে, কুলীন কন্যার পিতার বংশকে কৃতার্থ করে, সত্বর অপর গ্রামে অপর শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করবার জন্য যাত্রা করত। অনেকে আবার রাত্রিকালে নিদ্রিতা স্ত্রীর অলঙ্কার অপহরণ করে ও সরে পড়ত।

অনেক সময়ই এরূপ বিবাহ-পেশাদারী কুলীন ব্রাহ্মণরা শ্বশুরবাড়ির পথঘাটের সঙ্গে সম্যক পরিচিত থাকত না। কথিত আছে এরূপ এক কুলীন ব্রাহ্মণ এক গ্রামে গিয়ে শ্বশুরবাড়ি চিনতে না পেরে, পথে পুষ্করিণী থেকে স্নানান্তে প্রত্যাগতা এক যুবতীকে দেখে তাকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করে—'মা, অমুকের বাড়ি এ গ্রামের কোথায় বলতে পার ?' তিনি কেন সন্ধান করছেন জানতে চাইলে ব্রাহ্মণ বলে—'আমি তাঁর জামাই।' সে কথা শুনে সেই কন্যা বুক পর্যন্ত অবগুণ্ঠিতা হয়ে, তাকে নিজ গৃহে নিয়ে যায়।

আগেই বলেছি যে এ-সমাজের মেয়েরা বিয়ের পর বাপের বাড়িতেই থেকে যেত। স্বামী ক্বচিৎ কদাচিৎ শ্বশুরবাড়ি আসত। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি এলে কি হবে ! বিনা দক্ষিণায় তারা কখনও স্ত্রীর সহিত মিলিত

হতো না। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এর এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে এক কুলীনের মেয়ের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন—

আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই ॥
বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্বিয়া হবে কিনা বিয়া হবে আগে ॥
দু-চারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার ॥
সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্টি মুখ নতুবা রুষ্ট হয়ে যায় ॥

সুতরাং এরূপ সমাজে যে-সব মেয়ের যৌনক্ষুধা প্রবল, তাদের ক্ষেত্রে যা ঘটত তা সহজেই অনুমেয়। গোপন অভিসার কুলীন কন্যাদের স্বভাবে দাঁড়িয়েছিল। আদিম যৌনক্ষুধাকে তারা অস্বীকার করতে পারত না। অবৈধ সহবাসে তারা লিপ্ত হতো। বস্তুতঃ খ্রীস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামনারায়ণ তর্করত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেটা খোলাখুলিই বলেছিলেন। রামনারায়ণ তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে পিতা-পুত্রের সংলাপের ভিতর দিয়ে সেটা বলেছেন। পুত্র তিন বৎসর শ্বশুরবাড়ি যায়নি। হঠাৎ খবর এল তার একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। পুত্র আশ্চর্য হয়ে পিতাকে যখন এ কথা বলছে, তখন পিতা বলছেন— 'বাপু হে, তাতে ক্ষতি কি? আমি বিবাহ করবার পর একবারও শ্বশুর বাড়ি যাইনি। শুভদৃষ্টির পর একেবারে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়।'

কুলীন কন্যাদের যখন স্বামী ব্যতীতই গর্ভ হতো, তখন মেয়ের মায়েরা কি কৌশল অবলম্বন করে সেই সন্তানের বৈধতা পাড়াপড়শীদের কাছে জানাতো, তা বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর 'বহুবিবাহ' নিবন্ধে বিবৃত করেছেন। বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছেন—

'কোনও কারণে কুলীন মহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরিপাকার্থে কন্যাপক্ষীয়দিগকে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া জামাতাকে আনয়ন। তিনি আসিয়া

শবশুরালয়ে দু-একদিন অবস্থিতি করিয়া, প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ তৎসহযোগে সম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে কৃতকার্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচার সহচরী ভ্রূণহত্যাদেবীর আরাধনা। এ অবস্থায় এতদ্ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ, অতি নির্দোষ ও সাতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই এবং ভ্রূণহত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী বা বাটির অপর কোন গৃহিণী একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটি গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথা প্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন, হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল কোথায় কি পাব, ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই। অনেক বলিলাম একবেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও। তিনি কিছুতেই রহিলেন না, বলিলেন, আজ কোন মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পরই অমুক গ্রামের মজুমদারের বাটিতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক; পরে অমুক দিন, অমুক গ্রামের হালদারের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে; সেখানেও যাইতে হইবেক। যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক দিয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন, তারা জামাইয়ের সঙ্গে খানিক আমোদ আহ্লাদ করিবে। একলা যেতে পারব না, বলিয়া ছুঁড়ী কোন মতেই এল না। এই বলিয়া সে ঐ দুই কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার জামাই এলে মা তোরা যাস ইত্যাদি। এইরূপে পাড়ায় বাড়ি বাড়ি বেড়াইয়া জামাতার আগমনবার্তা কীর্তন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতাকৃত বলিয়া পরিপাক পায়।'

এবার শুনুন শরৎচন্দ্র তাঁর 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে কি বলেছেন। 'পরম কুলীনের পরমা কুলীন কন্যা হিসাবে সন্ধ্যা বলল—আমি বামুনের মেয়ে নই।…আমার মা আমাকে সম্প্রদান করতে বসেছিলেন। এমন সময় মৃত্যুঞ্জয় ঘটক দু'জন লোক সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হল। বলল, তোমরা শোন, এই যাকে তোমরা পরম কুলীন প্রিয় মুখুজ্যে বলে জান সে বামুন নয়, মিহির নাপতের ছেলে। তারপর মৃত্যুঞ্জয় ঘটক গঙ্গাজলের ঘটটা ঠাকুরমার সামনে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বলুন সত্যি কিনা?

বলুন ও কার ছেলে ? মুকুন্দ মুখুজ্যের না হীরা নাপিতের ? আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা মাথা হেঁট করে রইলেন। কিছুতেই মিথ্যা কথা বলতে পারলেন না। একজন তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। সে তাদের গ্রামের লোক। বলল, আট বছর বয়সে ঠাকুরমার বিয়ে হয়, তারপর দশ-পনের বছর পরে একজন এসে জামাই মুকুন্দ মুখুজ্যে বলে পরিচয় দিয়ে বাড়ি ঢোকে। পাঁচ টাকা আর একখানা কাপড় নিয়ে সে দুদিন বাস করে চলে যায়। তারপর থেকে লোকটা প্রায়ই আসত। ঠাকুরমা খুব সুন্দরী ছিলেন—আর সে টাকা নিত না। তারপর যখন সে একদিন হঠাৎ ধরা পড়ে গেল, তখন বাবা জন্মেছেন। তারপর লোকটা বলল, ও কুকাজ সে নিজের ইচ্ছায় করেনি, তার মনিব মুকুন্দ মুখুজ্যের আদেশেই করেছে। একে বুড়ো মানুষ, তারপর পাঁচ-সাত বছর বাতে পঙ্গু, তাই অপরিচিত স্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ভার তার ওপর দিয়েছিল। হিরু নাপিত ঐ বামুনের পরিচয় মুখস্থ করে, একটা উপায় তৈরি করে রাখে। তখন থেকে যা কিছু রোজগার করে অর্ধেক ভাগ পায়। আরো দশ-বারো জায়গা থেকে সে এমনি করে প্রভুর জন্য রোজগার করে নিয়ে যেত।'

রামনারায়ণ তর্করত্ন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের রচনা থেকে আমরা বাঙলার কুলীন ব্রাহ্মণদের পরিচয় পাই। তারাই কুলীনের মেয়েদের পিতা, এবং তাদের মেয়েরাই কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া বিবাহ করতে পারত না। এই প্রথা নিবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগর মশাই যথেষ্ট আন্দোলন করেছিলেন, কিন্তু সরকারী সমর্থন পাননি। তবে তা সত্ত্বেও তাঁর আন্দোলনের ফলেই এই কুপ্রথা বাঙালী সমাজ থেকে গত শতাব্দীতে বিলুপ্ত হয়। তার ফলে কুলীনের মেয়েরা বিবাহিত জীবনে আজ সম্মান ও শুচিতা লাভ করেছে।

হিন্দু বিবাহ-বিধান

গত শতাব্দীতে হিন্দু মেয়েরা পেয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার। আর পুরুষ বঞ্চিত হয়েছে তার একাধিক বিবাহ করবার অধিকার। এছাড়া বিবাহের ন্যূনতম বয়স এখন বর্ধিত করা হয়েছে। এ সবই বিবাহের ওপর গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ফসল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে দেখা যাক্ বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের আগে কি প্রথা ও নিয়মকানুন ছিল।

আর্যরা এদেশে আসবার আগে যে সব বর্গের বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল তা হল যথাক্রমে রাক্ষস, গন্ধর্ব ও অসুর বিবাহ। কেননা এই সব বর্গের বিবাহের কোন উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই, অথচ এগুলি বর্তমানের আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে। বৈদিক যুগে মাত্র এক রকম বর্গের বিবাহই (ব্রাহ্ম বিবাহ) প্রচলিত ছিল, এবং তা প্রাপ্তবয়স্ক যুবক যুবতীদের মধ্যেই হত। এছাড়া তাদের অধিকাংশই নিজের পতি নিজেই নির্বাচন করতে পারত। এটা আমরা জানতে পারি ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে বর্ণিত 'সমন' উৎসব থেকে। এই উৎসবে যুবতীরা মনোমত পতি লাভের আশায় সুসজ্জিত হয়ে যোগদান করত। পরে দিদিষুর (মধ্যগ বা ঘটকের) আবির্ভাব ঘটে। তখন থেকেই 'সমন' উৎসবে পতি-নির্বাচনের প্রচলন কমে যায়।

বৈদিক যুগে বিবাহ কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে হত না, হত তার সমস্ত ভ্রাতাদের সঙ্গে। অন্তত আপস্তম্ভধর্মসূত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, কন্যাকে দান করা হয় কোন এক বিশেষ ভ্রাতাকে নয়, বংশের সমস্ত ভ্রাতাকে। এজন্য পরবর্তীকালে মনু বিধান দিয়েছিলেন যে, কলিযুগে কন্যার বিবাহ যেন সমগ্র পরিবারের সঙ্গে যৌথভাবে দেওয়া না হয়। ঋগ্বেদ এবং অথর্ববেদে কয়েকটি স্তোত্র আছে যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যদিও বধূকে জ্যেষ্ঠভ্রাতাই বিবাহ করত, তা হলেও তার কনিষ্ঠ সহোদরদের তার ওপর যৌনমিলন বা রমণের অধিকার থাকত। এই দুই গ্রন্থেই স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে 'দেবৃ' বা দেবর বলা হয়েছে। কেননা,

'দেবর' মানে 'দ্বিবর' বা দ্বিতীয় বর। ঋগ্বেদের এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে বিধবা বৌদি দেবৃকে তার দাম্পত্য শয্যায় নিয়ে যাচ্ছে।

ঋগ্বেদে যম-যমীর কথোপকথনে দেখা যায় যে যমের যমজ-ভগ্নী যমী যমের সঙ্গে যৌনমিলন প্রার্থনা করছে। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থেও সহোদর-সহোদরা বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত আছে। পরবর্তী কালে যখন গোত্র-প্রবর-সপিণ্ড বিধানের উদ্ভব হয়, তখন এটা বন্ধ হয়ে যায়। তবে দক্ষিণ ভারতে পিসতুতো বোন ও মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহ এখনও বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে উত্তর ভারতে নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ, যদিও আদিবাসী সমাজে এটার প্রচলন আছে। যেমন উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসী সমাজভুক্ত লাখের, বাগনী ও ডাফলা জাতির লোকরা বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করে। আসামের গারো জাতির লোকেরা বিধবা শাশুড়িকে বিবাহ করে। ওড়িশার আদিবাসী সমাজে শবর জাতির লোকেরা বিধবা খুড়িকে বিবাহ করে।

মহাভারতীয় যুগে আমরা চার রকমের বিবাহের উল্লেখ পাই, যথা ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব, অসুর ও রাক্ষস। কিন্তু সূত্রগ্রন্থসমূহে আট রকম বিবাহের উল্লেখ আছে। উপরোক্ত চার রকম ছাড়া, আর্য, প্রাজাপত্য, দৈব ও পিশাচ। এই সকল বিবাহের বর্ণনা আমার 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' বইয়ে দেওয়া আছে। তবে এখানে মাত্র একথাই বলতে চাই যে মহাভারতীয় ও রামায়ণী যুগের স্বয়ম্বরা বিবাহ রাক্ষস বিবাহেরই একটা সুষ্ঠু সংস্করণ।

বেদোত্তরযুগে নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজে বিবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ দ্বারা। তাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে মনুর মানব-ধর্মশাস্ত্র। মনুর বিধানসমূহের ভিত্তিতে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, সে আদর্শ গঠিত হয়েছিল নিম্নলিখিত বিধানসমূহ নিয়ে।

(১) বিবাহ নিষ্পন্ন হবে মন্ত্রপাঠে, যজ্ঞ সম্পাদন ও সপ্তপদীগমন দ্বারা।

(২) জাতি নির্বিশেষে সকলকেই পুত্র উৎপাদনের জন্য বিবাহ অবশ্যই করতে হবে।

(৩) কন্যার বিবাহ দিতে হবে সে ঋতুমতী হবার পূর্বে।

(৪) বিবাহ সংঘটিত হবে জাতির মধ্যে।

(৫) বিবাহ সগোত্রে, সপ্রবরে ও সপিণ্ডদের মধ্যে হতে পারবে না।

(৬) বিবাহিতা নারীকে সতীত্বের সমস্ত বিধান অনুসরণ করে পতিব্রতা হয়ে থাকতে হবে।

(৭) স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাকে সধবার ভূষণ পরিহার করে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে (পরে সহমরণ অনুসৃত হত)।

(৮) পরস্ত্রীগমন ব্যাভিচার বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য ব্যভিচারীকে গুরুদণ্ড পেতে হবে।

॥ দুই ॥

সাম্প্রতিককালে, গণতন্ত্রের প্রভাবে হিন্দুর বিবাহ জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। এর সূচনা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সনাতনী হিন্দু সমাজের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সক্ষম হয়েছিলেন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করতে। তিনি বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেনটিংককে সম্মত করেন ১৮২৯ সালে ২৭ নং আইন বিধিবদ্ধ করতে। এই আইন দ্বারা সতীদাহ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে ১৫ নং আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন দ্বারা বিধবার বিবাহ বৈধ করা হয়। তারপর ১৮৭২ সালের ৩ নং আইন দ্বারা অসবর্ণ বিবাহের বাধাও দূর করা হয়। তবে এই আইন অনুযায়ী বিবাহ করতে হলে বিবাহ ইচ্ছুক উভয় পক্ষকেই শপথ করতে হত যে তারা হিন্দু নন। কিন্তু ১৯২৩ সালের ৩০ নং আইন দ্বারা বিধান দেওয়া হয় যে অহিন্দু বলে ঘোষণা না করেও অসবর্ণ বিবাহ করা যাবে। ১৮৯১ সালের 'এজ অফ কনসেণ্ট অ্যাক্ট' দ্বারা বিবাহে সঙ্গমের ন্যূনতম বয়স নির্দ্ধারিত হয়। এরপর বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে রায় বাহাদুর হরবিলাস সরদা বদ্ধপরিকর হন হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ রোধ করবার জন্য। ১৯২৯ সালের ১৯ নং আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় যে হিন্দু বিবাহে ছেলের উপযুক্ত বয়স ন্যূনপক্ষে ১৮ ও মেয়ের বয়স ১৫ হওয়া চাই। (বর্তমানে ইহা বৃদ্ধি করে ২১ ও ১৮ করা হয়েছে)।

হিন্দু বিবাহ সংস্কারের জন্য দুটি বড় রকমের আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৯৪৬ সালে। ওই বৎসর ১৯ নং আইন দ্বারা, স্ত্রীকে অধিকার দেওয়া হয় অবস্থাবিশেষে স্বামী ত্যাগের জন্য। স্বামী যদি কুৎসিত ব্যাধিতে ভোগেন, বা স্বামী স্ত্রীর প্রতি এমন নিঠুর ব্যবহার করেন যাতে স্ত্রীর

নিরাপত্তার অভাব ঘটে, বা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন অথবা আবার বিবাহ করেন বা নিজ বাসগৃহে রক্ষিতা এনে রাখেন, বা ব্যভিচারে লিপ্ত হন কিংবা ধর্মান্তর গ্রহণ করেন, তাহলে ওই আইনের বলে স্ত্রী স্বচ্ছন্দে স্বামী ত্যাগ করে স্বতন্ত্র বসবাস করতে পারে। আর ২৮ নং আইনে নির্দেশ দেওয়া হয় যে সগোত্রে ও সমপ্রবরে বিবাহ বৈধ। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৯ সালের ২১ নং আইন দ্বারা বিবাহ ক্ষেত্রে জাতিগত বর্ণগত, শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত যত রকম বাধা-বৈষম্য ছিল, তা দূরীভূত করা হয়।

বিবাহ সম্পর্কে শেষ আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে ১৯৫৫ সালে। এটাই হচ্ছে বিবাহ সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনটিকে হিন্দু বিবাহ বিধি বা ১৯৫৫ সালের ২৫ নং আইন বলা হয়। বৈধ বিবাহের যে সকল শর্ত এতে নির্দিষ্ট হয়েছে সেগুলি হচ্ছে—

(১) বিবাহকালে স্বামীর স্ত্রী বা স্ত্রীর অন্য স্বামী জীবিত থাকবে না।

(২) উভয়পক্ষের কেহই পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হবে না।

(৩) ন্যূনপক্ষে বরের ১৮ (এখন ২১) ও কনের ১৫ (এখন ১৮) বৎসর বয়স হওয়া চাই।

(৪) উভয়পক্ষের কেহই নিষিদ্ধ নিকট আত্মীয়ের মধ্যে হবে না।

(৫) উভয়ের কেহই সপিণ্ড হবে না।

(৬) যেখানে কনের বয়স ১৫ (এখন ১৮) বছরের কম, সেখানে অভিভাবকের সম্মতির প্রয়োজন হবে।

এই আইনে আরও বলা হয়েছে যে সিদ্ধ বিবাহ অসিদ্ধ বলে। সাব্যস্ত হবে—

(১) যদি স্বামী পুরুষত্বহীন হয়।

(২) যদি বিবাহের সময় কোন পক্ষ পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

(৩) যদি প্রতারণা দ্বারা বা বলপূর্বক অভিভাবক দ্বারা দরখাস্তকারীর সম্মতি নেওয়া হয়ে থাকে।

(৪) যদি বিবাহের পূর্বে স্ত্রী স্বামী ব্যতীত অন্য কারোর দ্বারা গর্ভবতী হয়ে থাকে।

(৫) যদি অন্য স্ত্রী বা স্বামী বিদ্যমান থাকায় বিবাহ হয়ে থাকে।

(৬) যদি নিষিদ্ধ নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হয়ে থাকে।

এছাড়া নিম্নলিখিত কারণগুলির মধ্যে যে কোন একটি কারণ দেখাতে পারলে আদালত বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দিতে পারে—

(১) স্বামী বা স্ত্রী কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

(২) ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে যদি আর হিন্দু না থাকে।

(৩) আদালতের কাছে বিবাহ ভঙ্গের জন্য দরখাস্ত করবার পূর্বে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর স্বামী বা স্ত্রী কেউ যদি বিকৃত মস্তিষ্ক হয়।

(৪) ওই রকম তিন বৎসর কাল যদি স্বামী বা স্ত্রী অনারোগ্য কুষ্ঠ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

(৫) ওই রকম তিন বৎসর কাল স্বামী বা স্ত্রী কেউ যদি কোন সংক্রামক যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

(৬) স্বামী বা স্ত্রীর কেউ যদি অন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায়ে যোগদান করে সংসার ত্যাগ করে।

(৭) স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কেউ যদি ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর নিরুদ্দিষ্ট থাকে।

(৮) যেখানে জুডিশিয়াল সেপারেশনের ডিক্রির পর উভয়পক্ষ আর স্বামী-স্ত্রীরূপে সহবাস করেনি।

(৯) যদি রেস্টিটিউশন অভ কনজুগাল রাইটস-এর ডিক্রি হবার পর কোন একপক্ষ সেই ডিক্রি অমান্য করে অপর পক্ষ থেকে ক্রমান্বয়ে দু-বৎসর পৃথক বসবাস করে।

এছাড়া আরও দুটি কারণে স্ত্রী আদালতের কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। এ দুটি কারণের প্রথমটি হচ্ছে—যদি এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকতে স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে এবং আদালতে প্রার্থনা করবার সময় সেই স্ত্রী জীবিত থাকে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—স্বামী যদি বলাৎকরণ, পুংমৈথুন বা কোনরূপ অস্বাভাবিক যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে।

১৯৫৫ সালের বিবাহ আইন সম্পর্কে তিনটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম, বিবাহ সিদ্ধ হবার সময় থেকে তিন বৎসরের পূর্বে কোন পক্ষ আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন দরখাস্ত করতে পারবে না, দ্বিতীয়, আদালত কর্তৃক বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দেবার পর যদি তার বিপক্ষে কোন আপীল না করা হয়ে থাকে তাহলে এক বছর অপেক্ষা করে উভয় পক্ষই পুনরায় বিবাহ করতে পারে (যদি বিবাহ না করে তাহলে

আদালত খোরপোষের দাবি গ্রাহ্য করতে পারে), এবং তৃতীয়, আদালত কর্তৃক বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও ওই নির্দেশের পূর্বে স্ত্রী যে সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে সে সন্তান বৈধ বলে গণ্য হবে।

আশা করা হয়েছিল যে এই আইন প্রণয়নের ফলে হিন্দু-বিবাহ যে শুধু গণতান্ত্রিকতা লাভ করবে তা নয়, বিবাহিতা হিন্দু নারী সামাজিক ও পারিবারিক নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। কিন্তু আমাদের সে আশা আজ বিনষ্ট। নারী-মুক্তির পরিবর্তে এসেছে নারী নির্যাতন। প্রতিদিনই খবরের কাগজে একটি-দুটি বধূ নিধনের খবর প্রকাশিত হয়। আদিম বর্বরতার বশীভূত হয়ে শ্বশুর শাশুড়ি, ননদ-দেবর, এমন কি স্বামী সকলেই হয় আগুনে পুড়িয়ে নয়তো গলায় ফাঁস লাগিয়ে বা বিষ খাইয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব ধরনের মেয়েই এর শিকার। তাই আজ অধিকাংশ মেয়ের কাছে পবিত্র বিবাহবন্ধন একটা বিভীষিকা হয়ে উঠেছে।

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেই বধূহত্যার সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বধূনিধন যেন একটা খেলাধূলার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিশ্রুত বা প্রত্যাশিত পণ দিতে না পারাই বধূহত্যার প্রধান কারণ। তবু সমাজ থেকে পণপ্রথা উঠছে না! আইন হয়েছে, কিন্তু সে আইন কেউ মানছে না। পণ দেওয়া-নেওয়া পূর্ণোদ্যমেই চলেছে। কেবল তার জন্য কিছু নিরীহ মেয়ের জীবনাবসান ঘটছে।

বধূহত্যা না করে, বনিবনা না হলে অনায়াসেই বিবাহ-বিচ্ছেদের পথ বেছে নেওয়া যায়। তার জন্য আইনও রয়েছে। কিন্তু সে রাস্তায় কেউ পা বাড়াবে না। কারণ সেটা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তার চেয়ে অনেক সুবিধাজনক ও সস্তা হচ্ছে মেয়েটিকে মেরে ফেলা। আজ স্ত্রী শিক্ষার প্রসার যতটা ঘটেছে, তার চেয়ে বেশি প্রবল হয়েছে বধূনিধনের মত অমানুষিক নৃশংসতা।

মুসলিম বিবাহ ও তিন তালাক

বিগত শতকের শেষার্ধে গণতান্ত্রিক প্রভাব যে মাত্র হিন্দুর বিবাহের ওপরই পড়েছে, তা নয়। মুসলিম বিবাহের ওপরও পড়েছে। তবে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি মৌলবাদী। মৌলবাদীদের মতে মুসলিম সমাজের বিবাহ কোরান বা শরিয়াত অনুযায়ী হওয়া চাই।

মুসলিমসমাজে বিবাহ সম্পর্কে বাধানিষেধ হিন্দুসমাজের তুলনায় অনেক কম। তবে প্রথম বিবাহ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনূঢ়া মেয়ের সঙ্গে হওয়া চাই। পরবর্তী বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধানিষেধ নেই। হিন্দুদের মত মুসলমানসমাজে কোন গোত্রবিভাগ নেই। সেই কারণে বহির্বিবাহের কোন নিয়ম-কানুনও নেই। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে পারে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হয় না তবে বাঞ্ছনীয় বিবাহ হিসাবে খুড়তুতো, জাঠতুতো, মাসতুতো, মামাতো, পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে। এরূপ ভাইবোন থাকলে তাদের মধ্যে বিবাহই অগ্রাধিকার পায়। তা না হলে অন্য পরিবারে বিবাহ হয়। এরূপ বিবাহের সমর্থনে বলা হয় যে, এতে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় ও সম্পত্তি অবিভক্ত অবস্থায় থাকে। তবে কোন কোন জায়গায় ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহের বিরোধিতাও লক্ষিত হয়।

হিন্দুসমাজের মত মুসলিমসমাজেও বিবাহ সর্বজনীন ব্যাপার। সকলকেই বিবাহ করতে হয় এবং চিরকৌমার্য কখনও উৎসাহিত করা হয় না। মুসলিমসমাজে ১৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যে কোন পুরুষ বিবাহ করতে পারে। অভিভাবকদের সম্মতি নিয়ে ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বিবাহ চলে। মুসলিমসমাজে বিবাহে বর ও কনে উভয়েরই সম্মতির প্রয়োজন হয় এবং তা বিশেষভাবে স্পষ্টতার সঙ্গে প্রকাশ করতে হয়। দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের সামনে বিবাহের প্রস্তাব ও স্বীকৃতি একই সময় করতে হয়।

প্রতারণা বা বলপ্রয়োগ দ্বারা বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হয়। মুসলিমসমাজে কোন স্ত্রীলোক মুসলমান ব্যতীত অপর কাহাকেও বিবাহ করতে পারে না। তবে পুরুষরা মুসলমান ব্যতীত "কিতাবিয়া" (ক্রীশ্চান বা ইহুদী) নারীকেও বিবাহ করতে পারে। মুসলিমসমাজে বহুপত্নী গ্রহণের কোন বাধা নেই। তবে চারটির বেশি পত্নী গ্রহণ নিয়মবিরুদ্ধ বলে ধরা হয়।

যদি বিদ্যমান সম্পর্ক অবৈধ বলে গণ্য না হয় তাহলে মুসলিমসমাজে স্ত্রী-পুরুষ যেখানে স্থায়ীভাবে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করে আসছে কিংবা পুরুষ যদি স্বীকার করে যে সে নারী তার স্ত্রী তাহলে সে সম্পর্ককে বিবাহের পর্যায়ে ফেলা হয়। ইসলামধর্মাবলম্বী কোন কোন শাখার মধ্যে "মোতা" নামে একরকম বিবাহ প্রচলিত আছে। "মোতা" বিবাহ হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িক বিবাহ। অনেক সময় এরূপ বিবাহ মাত্র একদিনের জন্যও স্থায়ী হয়। এরূপ বিবাহে স্ত্রীধনও দেওয়া হয়। কিন্তু এরূপ বিবাহের ফলে উৎপন্ন সন্তানের কোন উত্তরাধিকার থাকে না। তবে পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে এরূপ সন্তানের উত্তরাধিকার দেওয়া চলে। অবশ্য উত্তরাধিকার না থাকলেও সন্তানের বৈধতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা বিবাদ ওঠে না। বিচ্ছেদের পর এরূপ বিবাহে স্ত্রী কোনরূপ ভরণপোষণ পায় না। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে বা তার পূর্বে উভয়ের মধ্যে কেউ মারা গেলে বা স্বামী যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই সময়ের মকুব করে তাহলে এরূপ বিবাহের ছেদ ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্ত্রীকে "ইদ্দত" উদযাপন করতে হয়। মুসলিমসমাজে "ইদ্দত" বলতে বোঝায় এক বিবাহ বিচ্ছেদের সময় থেকে অপর বিবাহের মধ্যবর্তীকালীন অপেক্ষা করবার সময়।

আদালতের সাহায্য ব্যতিরেকে মুসলিমসমাজে সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ করা যায়। এ সম্পর্কে প্রথাগত রীতি অনুযায়ী ছ'রকম পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে "তালাক" উচ্চারণ করে দাম্পত্য সম্পর্কের ছেদ ঘটানো। যদি "তালাক" একবার উচ্চারণ করা হয় তাহলে তালাকের পর "ইদ্দত" পালন করতে হয়। আর এক রকমের "তালাক" হচ্ছে স্ত্রীলোকের ক্রমান্বয় তিনটি "তুড়"-এর (মাসিক ঋতু) সময় তিনবার "তালাক" উচ্চারণ করা। তবে প্রত্যাহার না করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে একই সঙ্গে তিনবার "তালাক" উচ্চারণ করা যেতে পারে। "তালাক" উচ্চারণের সময় কোন সাক্ষী বা স্ত্রীর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী

নেপথ্যে থাকলেও "তালাক" দেওয়া যেতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে 'ইলা'। 'ইলা' হচ্ছে ব্রত গ্রহণ করে চারমাস স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম না করা। তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে 'জিহার'। 'জিহার' হচ্ছে স্বামী যদি বিবাহের জন্য সম্পর্কিত কোন আত্মীয়ার নাম উচ্চারণ করে, তাহলে স্ত্রী তাকে 'তালাক' উচ্চারণ করতে বাধ্য করাতে পারে। স্বামী যদি অস্বীকৃত হয় তাহলে স্ত্রী আদালতে গিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করতে পারে। চতুর্থ পদ্ধতি হচ্ছে 'খোলা'। যেখানে স্ত্রী স্বামীকে রাজি করিয়ে এবং তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদকে 'খোলা' বলা হয়। পঞ্চম পদ্ধতিকে 'মুবারত' বলা হয়। 'মুবারত' হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ-বিচ্ছেদ। 'মুবারতে'র সঙ্গে 'খোলা'-র প্রভেদ হচ্ছে এই যে, 'খোলা' পদ্ধতিতে স্ত্রী-ই বিবাহ-বিচ্ছেদ চায় আর 'মুবারত' পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিবাহ-বিচ্ছেদ চায়। বিবাহ-বিচ্ছেদের ষষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে 'তালাক-ই-তাফয়ুজ'। এ ক্ষেত্রে স্বামী দ্বারা আদিষ্ট হয়ে স্ত্রী-ই 'তালাক' উচ্চারণ করে।

আদালতের আশ্রয় নিয়েও মুসলিমসমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা যায়। এ সম্বন্ধে ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইনের ২নং ধারায় যে সকল কারণে আদালতকে বিবাহ-বিচ্ছেদ গ্রাহ্য করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ

(১) চার বৎসর যদি স্বামীর কোন খোঁজ-খবর না পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আদালতের রায় ছ'মাসের জন্য মুলতুবী রাখা হয় এবং ওই সময়ের মধ্যে স্বামী যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ওই রায় বাতিল হয়ে যায় ;

(২) দু বৎসর যদি স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণে অমনোযোগী হয় ;

(৩) সাত বা ততোধিক বৎসরের জন্য যদি স্বামীর কারাদণ্ড হয় ;

(৪) তিন বৎসর যদি স্বামী তার দাম্পত্যধর্ম না পালন করে ;

(৫) স্বামী যদি নপুংসক হয়। এক্ষেত্রে তার প্রজননশক্তি প্রমাণ করবার জন্য স্বামীকে এক বৎসরের জন্য সময় দেওয়া হয় ;

(৬) দু বৎসর ব্যাপী স্বামী যদি উন্মাদ রোগাক্রান্ত হয় ;

(৭) স্বামী যদি কুষ্ঠ বা কোন কুৎসিত যৌনব্যাধিগ্রস্ত হয় ;

(৮) ১৫ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হবার আগেই যদি পিতামাতা বা

অভিভাবকের সম্মতি অনুসারে তার বিবাহ হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী ১৮ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হবার পর স্বামীকে পরিহার করতে পারে ;

(৯) স্বামী যদি স্ত্রীকে দৈহিক বা মানসিক কোনরূপ পীড়া দেয়।

যদিও কারণ বিশেষে আদালতের আশ্রয় নিয়ে মুসলিমসমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা যায় তা হলেও 'তালাক' দ্বারা বিবাহ-বিচ্ছেদ করা মুসলিম-সমাজের প্রথাগত পন্থা। তালাক দ্বারা বিবাহ-বিচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য এই যে তালাক দেবার পর স্বামীর স্ত্রী সম্বন্ধে আর কোন দায়িত্ব থাকে না। এ সম্বন্ধে মুসলিমসমাজের ব্যক্তিগত আইন (Personal Law) বলবৎ থাকে। এই আইন অনুযায়ী তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর নয় ; তার পুত্রদের কিংবা তার পিতামাতার বা পিতৃকুলের আত্মীয়দের। তারা যদি এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে এ দায়িত্ব ওয়াকফ্ বোর্ডের ওপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট শাহবানু মামলায় তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার তার প্রাক্তন স্বামীর ওপরই ন্যস্ত করে। এই নিয়ে মুসলিম সমাজে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্ট হয়। চতুর্দিকে রব তোলা হয় যে সুপ্রিম কোর্ট প্রাক্তন স্বামীর ওপর তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্ব অর্পণ করে শরিয়াতের বিধান লঙ্ঘন করেছে। বলা হয় যে এই রায় দ্বারা সুপ্রিম কোর্ট মুসলিম ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছে।

এর পদক্ষেপে ভারত সরকার সংসদে 'মুসলিম মহিলা (তালাকের পর অধিকার সংরক্ষণ) বিল' আনে। এই বিলের বিরুদ্ধে ১০২টি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়। সংসদে অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর বিলটি ৮ মে ১৯৮৬ তারিখে বিধিবদ্ধ হয়। সংশোধনের পর আইনটি যে রূপ নিয়েছে তাতে তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত-এর (শরিয়াত অনুযায়ী পুনরায় বিবাহের নিষিদ্ধ কাল) সময় পর্যন্ত স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ পাবে ; তারপর তার ভরণপোষণের ভার নিতে হবে তার পিতৃ-পরিবার বা অন্য আত্মীয়বর্গকে ; তারা যদি সে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে, তাহলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে 'ওয়াকফ বোর্ড'।

সবশেষে মুসলিম সমাজে তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে উচ্চ আদালতের দুই রায়ের কথা বলব। গুয়াহাটি হাইকোর্টের দুই বিচারপতি এস. বি. রায় ও আর. কে. মনিসেনাকে নিয়ে গঠিত এক

ডিভিসন বেঞ্চ রায় দেন যে স্বামী স্ত্রী উভয় পক্ষের লোকজন প্রথমে ভালরকম আলোচনা করে বুঝে নেবেন, তারপর তালাক কার্যকর হবে। মামলাটা ছিল বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ে তালাক কার্যকর হয়নি।

শেষ সংবাদ। ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি হরিনাথ তিলহরি এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেছেন 'একবাক্যে তিন বার তালাক বে-আইনী। এটা অসংবিধানিক ও অমানবিক।'

সুপ্রিম কোর্টের শাহবানু মামলায় বলা হয়েছিল ফৌজদারী আইনের আওতায় পরিত্যক্তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে তার প্রাক্তন স্বামীকে। কিন্তু তালাককে বে-আইনী বা অসাংবিধানিক বলা হয়নি।

পরিশেষে মুসলমান সমাজে বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলে এ অধ্যায় শেষ করব। ধর্মান্তরিত অন্যান্য সমাজের ন্যায় বাঙালী মুসলমান সমাজেও চিরাচরিত হিন্দুসমাজের অনেক লোকাচার পালিত হয়। যেমন বিবাহের পূর্বে বরকনেকে আশীর্বাদ করা, আইবুড়োভাত বা থা দেওয়া, গায়ে হলুদ দেওয়া, জল আনা, লৌকিক গীত গাওয়া, বরের সঙ্গে নিতবরের যাওয়া, বিয়েতে বরকনের গাঁটছড়া বাঁধা, বাসর ঘরের কৌতুক, নাপিতের ভূমিকা (নাপিতকে সিদে দেওয়া), 'দুধভাত' যেটা হিন্দু বিবাহের কনকাঞ্জলির সমতুল, কোন কোন জায়গায় সিন্দুর দান ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এসব লোকাচার ছাড়া মূল মুসলমান বিবাহ অনুষ্ঠান সাক্ষীর সমক্ষে মৌলবীর দ্বারা সম্পাদিত হয় ও মৌলবী এজন্য দক্ষিণা পান।

বিয়ে বাড়ির আদব

গত একশ বছর সময়কালের মধ্যে বাঙালীর বিয়ে বাড়ির অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত বিয়ে বাড়িতে সানাই বাজত। আজ আর তা বাজে না। তার স্থান দখল করে নিয়েছে মাইক-নিনাদিত গান। বিয়ের শাস্ত্রীয় আচারসমূহ ও মেয়েদের কৃত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানসমূহ এখনও বজায় আছে বটে, কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন ও ভোজনের ব্যাপারে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় ভোজপণ্ডিদের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিয়ে বাড়িতে ফলার ও ভাতের পরিবর্তে লুচি খাওয়ানো প্রবর্তিত হয়েছিল। বিয়েবাড়ির রান্নাবান্নার ব্যাপারেও পাঁচ বাড়ির গিন্নিবান্নিদের আধিপত্যেরও অবলুপ্তি ঘটেছিল। তাদের স্থান দখল করে নিয়েছিল উড়িয়া বামুনের দল।

এই পরিবর্তিত পরিবেশেই আমি আমার ছেলেবেলার বিয়েবাড়ির রীতিনীতি দেখেছি। তখন সামাজিক রীতিনীতি ও জাতপাতের প্রাবল্য ছিল খুব কঠোর। তার একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় ছিল না। আমার যখন পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়স, তখন পর্যন্তও ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ, পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে, কর্মকর্তাকে নিজে কিংবা তাঁর কোন আত্মীয়কে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণবাড়িতে গিয়ে করে আসতে হত। শহরে এ প্রথা এখন উঠে গিয়েছে। জানিনা পল্লীগ্রামে এখনও প্রচলিত আছে কিনা।

॥ দুই ॥

ভোজনের ব্যাপারে জাতপাতের ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠোর ছিল। ব্রাহ্মণদের সর্বাগ্রে ভোজন করাতে হত। গৃহকর্তাকে সমবেত অতিথিদের সামনে গিয়ে বলতে হত—'আপনাদের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের গাত্রোস্থান করতে আদেশ হউক।' তাছাড়া ভোজ্যাদি ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবেশিত করতে হত। ভোজনের শেষে ব্রাহ্মণরা দক্ষিণা পেতেন।

ভোজন দক্ষিণার হার ছিল চার আনা থেকে এক টাকা। ব্রাহ্মণ ভোজন হয়ে গেলে, তারপর ব্রাহ্মণেতর জাতিদের ডাকা হত।

আত্মীয়স্বজনদের বাড়ির মেয়েদের নিমন্ত্রণ বাড়ির মেয়েদের গিয়ে করতে হত। তা না হলে মেয়ে-নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হত না। এছাড়া নিমন্ত্রিতা মেয়েদের তাদের বাড়ি থেকে গাড়ি করে নিয়ে আসতে হত, এবং ভোজন পর্বের পর তাঁদের আবার গাড়ি করে নিজ নিজ বাড়িতে পেঁছে দিতে হত। গত ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে এ প্রথা উঠে গেছে। আর যে সব নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দূর থেকে আসতেন, তাঁরা কর্মকর্তার কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া বাবদ বেশ কিছু টাকা আদায় করে নিতেন। তাও উঠে গেছে।

॥ তিন ॥

আর একটা প্রথাও এই সময়কালের মধ্যে উঠে গেছে। সেটা হচ্ছে বিবাহ বাসরে 'প্রীতি উপহার' বিতরণ করা। এগুলো কবিত্বপূর্ণ কাগজ। এগুলো হয় গোলাপী রঙের বা রুমাল-সদৃশ এক রকম কাগজে লাল কালিতে বা সোনার জলে ছাপা হত। এগুলো বিয়ে বাড়ির মর্যাদার একটা মাপকাঠি ছিল। কেননা, লোক বিচার করত বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ কে ক'খানা 'প্রীতি উপহার' বিলি করেছে।

মনে রাখতে হবে যে আমার ছেলেবেলাটা ইলেকট্রিক আলোর যুগ ছিল না। সেজন্য বিবাহ বাসর আলোকিত করবার জন্য 'খাস গেলাস' ও ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠন ব্যবহৃত হত। এগুলো রেড়ির তেল বা মোম-বাতির সাহায্যে জ্বালানো হত। পরে ছাদের ওপর হোগলার মেরাপের তলায় যেখানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়ানো হত, সেখানে থাকত কারবাইড গ্যাসের আলো।

শতাব্দীর গোড়ায় সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ির বর আসত চতুর্দোলায় চেপে। ব্যাণ্ড বাজত ও দুধারে আলোর শোভা থাকত। ফিরে যাবার সময় কনে যেত মহাপায়ায় করে। ১৯২০ সাল নাগাদ এগুলো সব উঠে যায়।

বর এলে বরযাত্রীদের গায়ে গোলাপ জল ছিটানো হত। বরকে বসানো হত বরের আসনে। দুধারে থাকত দুটো ফুলের তোড়া ও দুটো বাতিদান। বরযাত্রীদের গলায় মালা পাড়িয়ে দেওয়া হত। এটাই

ছিল বরযাত্রীদের লক্ষণ। কেননা বরযাত্রীদের বিশেষ সমাদর করে কন্যাপক্ষীয়দের আগে খাওয়ানো হত।

॥ চার ॥

এবার বলি বিয়ের নিমন্ত্রণে কি খাওয়ানো হত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সাধারণত খাওয়ানো হত কর্মকর্তার নিজবাড়িতে, এখনকার মত 'বিয়েবাড়ি' ভাড়া করে নয়। এর জন্য বাড়ির ছাদে হোগলা দিয়ে একটা মণ্ডপ তৈরি করা হত। তারপর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের হালসীবাগানের সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর হোগলা দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পদাঙ্কে নানারকম উপায় অবলম্বিত হয়, যার শেষ ফলশ্রুতি হচ্ছে ভাড়াকরা 'বিয়েবাড়ী'। আরও যা পরিবর্তন ঘটেছে তা হচ্ছে, সেকালে বিয়েবাড়িতে মেঝের ওপর কুশাসন পেতে বসিয়ে কলাপাতার ওপর খেতে দেওয়া হত। কলাপাতার ডানদিকের সর্বোচ্চ কোণে থাকত লবণ ও একখণ্ড পাতিলেবু। আর কলাপাতার সামনে থাকত জলপূর্ণ মাটির গেলাস ও দই ও ক্ষীর দেওয়ার জন্য মাটির খুরি। ভোজনপর্ব শুরু হত দু'খানা গরম লুচি ও বেগুন বা পটল-ভাজা দিয়ে। ক্রমে ক্রমে আসত কুমড়ার ছক্কা (বা শীতকালে বাঁধাকপির তরকারী), ডাল, ধোঁকা বা আলুর দম, মাছের কালিয়া, চাটনি, পাঁপড় ভাজা ও মিষ্টান্ন। মিষ্টান্নের মধ্যে দেওয়া হত মিহিদানা, লেডিকেনী, রস-গোল্লা, সন্দেশ, দই, ক্ষীর। সকলের শেষে দেওয়া হত পান। এটা সাধারণ গহস্থবাড়ির বিয়ের ভোজ্যের ফর্দ। এটাই ছিল মধ্যবিত্ত গৃহস্থবাড়িরও বিয়ের ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা। অবস্থাপন্ন গৃহস্থবাড়িতে এর সঙ্গে যুক্ত হত পোলাও, মাংস, আরও অনেক রকম মিষ্টান্ন ও রাবড়ি। ভোজনের সময় পরিবেশনকারীরা দফায় দফায় আনত সবরকমই ভোজ্যদ্রব্য। তার মানে আগেকার দিনের বিয়ে বাড়িতে যে যত খেতে চাইত, সে তা পেত।

সেকালের বিয়ে বাড়িতে ছাঁদা বাঁধার একটা রেওয়াজ ছিল। ছাঁদা-বাঁধা হচ্ছে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য একখণ্ড কাপড়ে পরিবেশিত সমস্ত রকম দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষ করে লুচি ও মোণ্ডা বেঁধে নেওয়া।

আর একটা রীতি ছিল। ভোজন সমাপ্তির পূর্বে কর্মকতা সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে, ভোজনে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা

তা জিজ্ঞাসা করতেন।

মেয়েদের খাওয়ানো পৃথক পংক্তিতে করা হত এবং সেখানে মেয়েরাই পরিবেশন করত। সেখানে ভোজনের শেষে গৃহকর্ত্রী এসে প্রত্যেককে ভোজনে সন্তোষ লাভ করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করত।

এখন বিয়ে বাড়ির খাওয়ানোর ব্যাপারটা ঠিকেদার ক্যাটারারদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাদারও হ্রাস পেয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

সেকালে লৌকিকতা করা হত আট আনা বা এক টাকা দিয়ে। বিশিষ্ট অতিথিরা বা আত্মীয়রা চার টাকা পর্যন্ত দিতেন। পরে টাকার বদলে বই উপহার দেবার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। এখন দামী কাপড় বা অন্য দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়। এ বিষয়ে এক পরিবার অপর পরিবারের সঙ্গে পাল্লা দেয়। আজ মধ্যবিত্ত সমাজের অবনতির এটাও একটা কারণ। লৌকিকতাটা আজ সমাজ থেকে উঠে যাওয়া উচিৎ।

শতাব্দীর মর্মন্তুদ অগ্নিকাণ্ড

আগের অধ্যায়ে আমরা বলেছি যে কলকাতায় হোগলা দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা ঘটেছিল এক মর্মন্তুদ অগ্নিকাণ্ডের জেরে। কলকাতার ইতিহাসে এরকম নিদারুণ ও শোকাবহ অগ্নিকাণ্ড শহরের বুকে আগে আর কখনও ঘটেনি, পরেও নয়। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪২ সালের ৮ নভেম্বর রবিবারে। ৫-এ হালসীবাগান রোডে অবস্থিত 'আনন্দ আশ্রম' প্রাঙ্গণে কালীপুজো উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী এক আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। হোগলা দিয়ে এক প্যাণ্ডেল তৈরি করা হয়েছিল। ঘটনার দিন প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবিদ বিষ্ণু ঘোষ তার দলবল নিয়ে ব্যায়াম-কৌশল দেখাচ্ছিল। বিষ্ণু ও ওর দলের তখন শহরে খুব জনপ্রিয়তা ছিল। সেজন্য একহাজারের ওপর মেয়ে, পুরুষ ও শিশু ওখানে জড়ো হয়েছিল। আমিও ওই দলের মধ্যে ছিলাম। দেরীতে গিয়েছিলাম বলে আমি ও আমার সঙ্গীরা গেটের কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। সেজন্যই সেদিন পৈতৃক প্রাণটা বেঁচে গিয়েছিল।

বেলা তখন পৌনে চারটে হবে। বিষ্ণুর দল বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই তাদের ব্যায়াম-কৌশল দেখাচ্ছিল। সকলে মুগ্ধনয়নে দেখছিল বিষ্ণুর তেরো-বছরের ছেলে কেষ্টর ব্যায়াম-কৌশল। এমন সময় মণ্ডপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে লোক চিৎকার করে উঠল 'আগুন, আগুন'! মণ্ডপের দক্ষিণ দিকটা জ্বলে উঠল। লেলিহান অগ্নিশিখা ক্রমশ অগ্রসর হতে লাগল। আমি ও আমার সঙ্গীরা ছুটে গেট দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর দেখলাম, ভেতরের সব লোকই গেটের দিকে ছুটে আসছে। সেখানে জমাট ভিড়। পুরুষেরা অধিকাংশই পাঁচিল টপকিয়ে বেরিয়ে এল। পিছনে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আটক হয়ে পড়ল মেয়ে ও শিশুরা। ১১৯ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল। আহতদের মধ্যে ত্রিশজনকে কারমাইকেল (আর. জি. কর) মেডিকেল কলেজে ও নয়জনকে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হল। তাদের মধ্যেও বারোজন কারমাইকেল কলেজে ও দুজন মেডিকেল কলেজে মারা গেল। বিষ্ণুর ছেলে কেষ্টও ওই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রাণ হারাল। সমস্ত শহরে বয়ে গেল শোকের স্রোত। কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। কর্তৃপক্ষ আইন জারি করল যে এর পর আর কেউ হোগলার মণ্ডপ তৈরি করতে পারবে না। সেই থেকেই শহরে হোগলার মণ্ডপ তৈরি করা বন্ধ হয়ে গেল।

কলকাতার দাঙ্গা

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর হাসান শহীদ সুরাবর্দী যখন নতুন সরকার গঠন করলেন, তখন তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে চাইলেন। কিন্তু মন্ত্রীসভায় কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা কি হবে, তাই নিয়ে মতানৈক্য হওয়ায় সে জোট আর হল না। এর ফলে উগ্র মুসলিমলীগ-পন্থী সুরাবর্দীর প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। ১৯২৬ সালের দাঙ্গার তিনিই ছিলেন নাটের গুরু। এবার ক্ষমতা নিজ হাতে আসায় তিনি আবার একটা দাঙ্গা বাঁধাবার তালে রইলেন। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ১৯২৬ সালের দাঙ্গার মত এবারও তিনি কাজে লাগালেন কলকাতার নিম্ন-কোটির গরীব বেকার মুসলমান, অবাঙালী মুসলমান, সমাজবিরোধী মুসলমান ও সরকারী পুলিশকে। জিন্না যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিল, সুরাবর্দী তখন সঙ্গে সঙ্গে সে ডাকে সাড়া দিল। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে নিজের দলকে তিনি ছেড়ে দিলেন কলকাতায় এক তাণ্ডব-লীলা চালাবার জন্য।

॥ দুই ॥

দাঙ্গা শুরু হল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে। হৈ-হল্লা করে মুসলমানরা এক মিছিল বের করল মানিকতলায়। মুখে তাদের মারমুখী বুলি—'লেকর রহেগা পাকিস্তান, লড়কে লেংগে পাকিস্তান।' নির্বিবাদে তারা আক্রমণ করল নিরীহ হিন্দুদের ওপর। হিন্দুদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট লুঠ করল, মেয়েদের বে-ইজ্জত করল, আগুন লাগিয়ে বস্তিকে বস্তি পুড়িয়ে দিল। পথচারীদের ছুরি মেরে খুন করল। এসব বিশেষ করে ঘটল সেসব পাড়ায় যেখানে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল কম। হিন্দুরাও এর পালটা জবাব দিল সে সব পাড়ায় যেখানে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা কম। সৈন্য, পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে সুরাবর্দী আগে থাকতেই নিষ্ক্রিয়

করে রেখেছিল। লালবাজারের কনট্রোল-রুমে বসে তিনি দাঙ্গার গতি-প্রকৃতির খবর নিতে লাগলেন। যখন দেখলেন যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে, এবং মুসলমানরাই বেশি মার খাচ্ছে, তখন কারফিউ জারী করা হল। কিন্তু শহর তখন সম্পূর্ণভাবে অরাজকতার কবলে গিয়ে পড়েছে। সকলেই নিরাপত্তার অভাব অনুভব করল। যানবাহন, কল-কারখানা সবই বন্ধ হয়ে গেল। চোরাগোপ্তা খুন-জখম সর্বত্রই হতে লাগল। ভয়ে লোক বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ করে দিল। শহর অচল হয়ে যাচ্ছে দেখে সুরাবর্দী সামনে ও পিছনে পুলিশের গাড়ি ও নিজ গাড়িতে দেহরক্ষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শরৎ বসুকে নিয়ে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে শহর পরিক্রমনে বেরুলেন। শান্তি খানিকটা স্থাপিত হল বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকই কেউ কারুকে আর বিশ্বাস করতে পারল না। হিন্দুরা মুসলমান পাড়ার ভেতর দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দিল ; অনুরূপভাবে মুসলমানরা আর হিন্দু পাড়ার ভেতর আসতে চাইল না। প্রথম পাঁচদিন দাঙ্গায় যে কতলোক হতাহত হয়েছিল, তার হিসাব আজ পর্যন্ত আমরা জানি না। তবে সরকারী মতে ৫০০০ জন নিহত, ১৫,০০০ জন আহত ও লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হয়েছিল। বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের মতে 'The loss of life in Calcutta riots was far greater than at the battle of Plassey'. হতাহতদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। এসময় আবুল কালাম আজাদ ভয় করেছিলেন যে ১৬ আগস্ট ছুটির দিন ঘোষণা করলে গোলমাল হবে জেনেও প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করা, ১৪৪ ধারা জারি ও সৈন্য ডাকতে অযথা বিলম্ব করা, এসবের প্রতিক্রিয়া বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে প্রকাশ পাবে এবং সেসব জায়গায় সংখ্যালঘু মুসলমানরাই মার খাবে। আজাদের ভয় সত্যেই পরিণত হয়েছিল। ২৩ আগস্ট এলাহাবাদে দাঙ্গা হল, ১ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে, ৯ সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গে, ১৪ সেপ্টেম্বর পুনরায় বোম্বাই ও ঢাকায়, ১৫ সেপ্টেম্বর আহমেদাবাদে, ২৩ সেপ্টেম্বর আবার কলকাতা ও ঢাকায়।

॥ তিন ॥

তামাম দুনিয়ার লোক সেদিন হতচকিত হয়ে গিয়েছিল নোয়াখালির বীভৎস ঘটনায়। বেঙ্গল প্রেস অ্যাডভাইসরী কমিটি তাঁদের প্রতিবেদনে লিখলেন—'উন্মত্ত জনতা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করছে, লুটপাট করছে, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ চলেছে···ঘটনা ঘটেছে নোয়াখালি সদর ও ফেনী মহকুমার ২০০ বর্গমাইল জুড়ে। মনে হয় এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট পূর্বপরিকল্পিত।' এছাড়া, ব্যাপকহারে চলেছিল ধর্মান্তরকরণ। একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক মধুসূদন চক্রবর্তী সেদিনকার ভয়াবহ ঘটনাসমূহ স্মরণ করে লিখেছেন—'সুরাবর্দী সরকারের সাহায্যপুষ্ট নোয়াখালির মোল্লা-মৌলানারা গোলাম সানোয়ারের নেতৃত্বে কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করেছে, নারীহরণ, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, অগ্নিসংযোগে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, তা অবর্ণনীয়। শ্বেতাঙ্গললনা মুরিয়েল লেস্টার উপদ্রুত অঞ্চল সফরান্তে ক্ষুব্ধভাবে প্রশ্ন তুলেছিলেন —মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের জন্য দায়ী কে? কে-ই বা গ্রাম্য মুসলমানকে উস্কানি দিয়ে নিরীহ হিন্দুদের ঘরবাড়ি পোড়ানোর জন্য স্টিরাপ পাম্প সরবরাহ করেছিল। কে-ই বা তাদের অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়েছিল? যিনি এসবের জন্য দায়ী, তিনি তখন ঘটনাস্থলে না গিয়ে দার্জিলিং চলে গেলেন গভর্ণরের সঙ্গে সেখানে মিলিত হওয়ার জন্য। সুরাবর্দির এই আচরণে বিস্মিত হয়ে 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকা লিখল—'The one remains at Darjeeling, the other has gone to join him there'. 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকা আরও লিখল—'মিলিটারী ও পুলিশকে কিছুই তোয়াক্কা না করে গুণ্ডারা তার কাটছে, পুল ভাঙছে, খাল বন্ধ করে দিচ্ছে, রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করছে।'

নোয়াখালির এই সব ভয়াবহ ঘটনার খবর যখন দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছাল, গান্ধীজী তখন কৃপালনীকে তথায় গিয়ে সরেজমিনে খবরাখবর নিতে এবং তাকে সব জানাতে বললেন। কৃপালনীর নিকট থেকে বিবরণ শুনেই মহাত্মা দিল্লী থেকে নোয়াখালির পথে যাত্রা করেন।

১৯৪৭ সালের ২০ নভেম্বর তারিখে গান্ধীজী তাঁর একান্ত সচিব হিসাবে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুকে সঙ্গে নিয়ে নোয়াখালি অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর এই যাত্রাকে 'মানবতার এক শ্রেষ্ঠ 'অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মা গিয়ে দেখলেন এক করুণ দৃশ্য। চতুর্দিকেই হিন্দুদের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচারের নিদারুণ নিদর্শন। নিজ নিজ গ্রামে হিন্দুরা ভয়ার্ত অবস্থায় বন্দী হয়ে আছে মুসলমান গুণ্ডাদের দ্বারা। হিন্দুদের মনে ভয় ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। বিভিন্ন গ্রামে মেয়েয়া শাঁখা-সিঁদুর পর্যন্ত পড়তে ভয় পাচ্ছে। গান্ধীজী দেখলেন, হিন্দুদের মন থেকে ভয় দূর করতে না পারলে, কোন রূপে শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি করা অসম্ভব। এই বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য তিনি 'করেংগে ইয়া মরেংগে' নীতি অবলম্বন করলেন। হয় হিন্দু-মুসলমান যাতে শান্তি ও সৌহাদ্যের সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন, আর তা নয়তো নিজের প্রাণ দেবেন। তিনি ভাবলেন সত্য ও অহিংসা পরীক্ষার, এই তো উপযুক্ত সময়। গান্ধীজীর সংকল্প সেদিন সার্থক হয়েছিল। নোয়াখালির শ্মশানশিবিরে তিনি কল্যাণময় শিবরূপে অতন্দ্র প্রহরী' হয়ে রইলেন। হিন্দুদের মন থেকে সেদিন ভয় কেটে গেল।

ভয় সাময়িকভাবে কাটল বটে, কিন্তু তার কোন চিরস্থায়ী ফল হল না। যে বিষবৃক্ষ স্যার আবদার রহিম ও তাঁর জামাতা এচ. এস. সুরাবর্দী রোপণ করেছিলেন, তা জীবিতই রইল। হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষই কেউ কারুকে আর বিশ্বাস করতে পারল না। বিদ্বেষ ও সংশয় পরস্পরের মনকে আচ্ছন্ন করল। স্বাধীনতা লাভের শর্ত হিসাবে দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পরও সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষ রোপণের পূর্বেকার সৌহাদ্যপূর্ণ পরিস্হিতি আর ফিরে এল না।

শতাব্দীর আর্থিক চিত্র

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে আকাশবাণী দিল্লি থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ভাষণের কিছু অংশ দিয়েই শুরু করি। নেহেরুজি বলেছিলেন, "Our long subjection and the world war and its aftermath have made us inherit an accumulation of vital problems and today our people lack food and clothing and other necessaries and we are caught in a spiral of inflation and rising prices. We want to solve these problems wisely so that the burden on the common man grow less and their standard of living go up." যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'আমাদের দীর্ঘদিনের অধীনতা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তার অনুবর্তী ঘটনাসমূহের ফলে আমরা জীবনের অনেক পুঞ্জীভূত গুরুতর সমস্যার উত্তরাধিকারী হয়েছি। আজ আমাদের দেশের লোকের খাদ্য, বসন ও নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর অভাব রয়েছে। আমরা মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির নাগপাশে বদ্ধ হয়েছি। আমরা বিচক্ষণতার সঙ্গে এসব সমস্যার সমাধান করতে চাই, যাতে সাধারণ লোকের ক্লেশের বোঝা হ্রাস পায় ও তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।'

॥ দুই ॥

সেই শুরু। নেহেরুর এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করতেই ১৯৫১ সাল থেকে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে ভারতীয় অর্থনীতির ভাগ্যচক্র। তবুও কিন্তু আজ এই ৪৭ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও আমরা পেলাম না অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়েই আমরা আজ বড়াই করি।

আজ এতদিন পর যদি আমরা প্রশ্ন করি কেন এমন হল, কেন রাজনৈতিক স্বাধীনতার হাত ধরে এল না অর্থনৈতিক স্বাধীনতা? উত্তর পাব, 'ভ্রান্ত নীতি'। প্রশ্ন উঠতেই পারে কোন জায়গায় ছিল ভুলটি? আসলে একটা ব্যাপার বুঝতে বোধহয় সাধারণ বুদ্ধির বেশি

কিছু প্রয়োজন হয় না, তা হল যে-দেশের প্রতি পাঁচজন মানুষের চারজন থাকে গ্রামে, সে দেশে এযাবৎ সাতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট খরচ হয়ে যাওয়া ৬৪৪২৭৬ কোটি টাকার মাত্র ১২% থেকে ১৪% প্রতিটি পরিকল্পনায় কৃষিতে খরচ হলে সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের আশা করাটা নিতান্তই বাতুলতা হয়ে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, ভুলটা ছিল ঠিক এক জায়গাটায়। কৃষিপ্রধান এই দেশের, যেখানে অধিকাংশ মানুষ গ্রামে থাকে, নির্ভর করে চাষবাসের ওপর, সেখানে পরিকল্পনার গোড়াতেই প্রয়োজন ছিল কৃষির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপের। ভারতের কৃষি ব্যবস্থা যেহেতু অধিকাংশটাই বৃষ্টি নির্ভর, তাই বৃষ্টির পরিমাণ নিশ্চিত করাটা জরুরি ছিল প্রথমেই। আর এজন্যই প্রয়োজন ছিল আরও আরও বেশি গাছ লাগানোর। অর্থাৎ প্রথমেই দরকার ছিল বনমহোৎসবের। কিন্তু সেই বনমহোৎসবের প্রয়োজনীয়তাটাই ভারতের রূপকারেরা অনুভব করলেন স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নয়, তিন-চার বছর পরে।

ওদিকে ভারতের কৃষি যেহেতু মরসুমি প্রকৃতির তাই চাষবাস ছাড়াও প্রয়োজন ছিল অন্য কোনও ক্ষেত্রের, যেখানে বছরের বাকী মাস যুক্ত থেকে আয়ের পথ নিশ্চিত করতে পারে গ্রামের মানুষ। তেমনই এক ক্ষেত্র হল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। আদপে নজরই দেওয়া হয়নি এ ব্যাপারে। আধুনিকীকরণের কোনও প্রচেষ্টাই হয়নি এই কুটির শিল্পের। ফলে ক্রয়ক্ষমতা কমেছে গ্রামের মানুষের।

কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজন ছিল সারের। তবে তা কখনই রাসায়নিক সার নয়। কারণ রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমির দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হয়ে থাকে। তাই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে উচিত ছিল আবর্জনা থেকে সার উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ রাসায়নিক সারের বদলে কম্পোস্ট সারের ওপর গুরুত্ব দেওয়াটা অনেক অনেক বেশি দরকারি ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এরই ফল ভুগতে হচ্ছে আজকে। আজ এতদিন পরে তাই নজর পড়েছে কম্পোস্ট সার উৎপাদনের দিকে।

॥ তিন ॥

অনেক জায়গায় শোনা যাচ্ছে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য গ্রামের নাকি প্রভূত উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আসল কথা হল যেখানে

রেলপথ রয়েছে কিংবা ইলেকট্রিক গ্রিড লাইন রয়েছে, উন্নতি হয়েছে সেই সব গ্রামেরই। ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামগুলি এখনও রয়ে গেছে আগের মতোই অনুন্নত অবস্থায়। সেখানে এখনও অধিকাংশ কৃষকই ভূমিহীন। তাঁরা অপরের জমিতে চাষবাস করে।

নিজেদের জমি তাঁদের কাছে আজও স্বপ্ন। কুটির শিল্পের আধুনিকীকরণের কণামাত্র সেখানে চোখে পড়ে না।

এতো গেল কৃষির কথা। ওদিকে শিল্পে ঘটে চলেছে আরেক ঘটনা। স্বাধীনতার দুই-তিন বছরের মধ্যেই শিল্পে দেখা দিয়েছে শ্রমিক বিরোধ। এই বিরোধ চাপা দিতে মজুরি বাড়ানো হয়েছে শ্রমিকের। ১৯৪৮ সালেই প্রথম কয়লা শিল্পের শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানায়। শ্রমিক বিরোধ এড়াতে বাড়ানো হয় মজুরি। সঙ্গে সঙ্গে এর প্রভাব অর্থনীতিতে না পড়লেও দিনের পর দিন এই ঘটনা চলতে থাকায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ও উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগত বেড়েছে। আর এর দরুণ বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারেনি ভারতীয় শিল্প। মার খেয়েছে রপ্তানি। টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বাধ্য হয়ে রপ্তানি বৃদ্ধির তাগিদে। কিন্তু শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির আমদানি বন্ধ করা যায়নি বলে অবমূল্যায়নের সুফল পাওয়া যায়নি।

যেসব ক্ষেত্রে বিকল্প পণ্য বাজারে এসেছে, সেসব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় আমরা দাঁড়াতে পারিনি। যেমন পাট শিল্পে দিনের পর দিন আমরা পিছিয়ে পড়েছি। তাই যে নেহেরু একদিন আশার বাণী শুনিয়েছিলেন ভারতবাসীকে, তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই কিন্তু একদিন প্রায় বাধ্য হয়ে বলেছিলেন, “Freedom is not freedom if it does not mean a better deal and more opportunity for the poor and the depressed.”

কাজেই সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজও আমাদের অধরা থেকে গেছে। তাই বলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ৪৭ বছর পরে আজ ১৯৯৪ সালে দাঁড়িয়েও বুকে হাত দিয়ে কোনও সরকারি মুখপাত্রই দাবি করতে পারবেন না যে আমরা সাধারণ মানুষের বাস্তব আয় অন্তত ৪৭ পয়সাও বাড়াতে পেরেছি কিংবা দ্রব্যমূল্য কমাতে পেরেছি অন্তত ৪৭ পয়সা।

পশ্চিমবঙ্গের নবরূপ

এই বইয়ের গোড়াতেই বলেছি যে বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করল, পশ্চিমবঙ্গকে তখন বহু উৎকট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভা বলে, তাঁর ১৮ বৎসর (১৯৪৮-১৯৬২) মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কালে ওই সব সমস্যার অধিকাংশই সমাধান করে ফেললেন।

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা পশ্চিমবঙ্গকে সমাধান করতে হল, তা হচ্ছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন করা। নানা জায়গায় তাদের জন্য শিবির স্থাপন করা হল ও সরকারী ভাতায় (doles) তাদের পরিচর্যা করা হল। তাছাড়া তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ও মেয়েদের বিবাহের জন্য সরকারী অনুদান দেওয়া হল। বহুক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণের জন্য সরকারী ঋণ দেওয়া হল। নিরাশ্রয়া মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও অশক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ আশ্রমে (Homes) যত্ন সহকারে রাখা হল। শরণার্থীদের জন্য পেশা বা বৃত্তিগত কারিগরী শিক্ষা দেবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। অনেক স্কুল কলেজ স্হাপন করা হল।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সমস্যাও তিনি অনুরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সমাধান করলেন। খাদ্য ও কাঁচামালের সমস্যা সমাধানের জন্য, কৃষির উন্নতির জন্য বহুমুখী পরিকল্পনাসমূহ রচনা করলেন। কৃষকদের উন্নত ধরনের ভূমিস্বত্ব দেবার জন্য জমিদারী প্রথা বিলোপ করলেন। সেচের ব্যবস্হা এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 'দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন' গঠিত করা হল। নদী ও খালসমূহ থেকে কৃষির সেচের জন্য যাতে জল পাওয়া যায়, তার ব্যবস্হা করা হল। এ ছাড়া, নানা স্হানে গভীর ও অগভীর নলকূপসমূহ বসানো হল। এসব করার ফলে কৃষির উৎপাদন অভূতপূর্বভাবে বেড়ে গেল। বিশেষ করে পাটের ক্ষেত্রে সামান্য পাঁচ লক্ষ গাঁট থেকে উৎপাদন পরিমাণ ৫০ লক্ষ গাঁটে বৃদ্ধি পেল।

সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধ সরবরাহের জন্য হরিণঘাটা ও বেলগেছিয়ায় 'ডেয়ারি'

স্হাপন করা হল। পরিবহনের ভার স্টেট্ ট্রানসপোর্ট করপোরেশনের হাতে ন্যস্ত করা হল, কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কও নির্মিত হল।

রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও পতিত জমির পুনরুদ্ধার করা হল। বস্তীবাসী ও শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য সরকারী 'হাউসিং এস্টেট' বা আবাসভবনসমূহ তৈরী করা হল। অনুরূপ আবাস-ভবন নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যম মধ্যবিত্তদের জন্যও তৈরী করা হল। বৃহত্তর কলকাতার জন্য এক পরিকল্পনা রচিত করা হল।

দুর্গাপুরে এক ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হল। দুর্গাপুর উপনগরী নির্মিত হল। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, হিন্দুস্হান কেবল ওয়ার্কস্ ও কোক ওভেন প্ল্যান্ট ও গ্যাস গ্রিড্ সিস্টেম চালু করা হল। কল্যাণীতেও একটা উপনগরী নির্মিত হল।

স্বাস্হ্য উন্নয়ন, দূষিত জল নিষ্কাশন ও আবর্জনা দূরীকরণের জন্যও বিশেষ চেষ্টা চলতে লাগল। এ সবই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে ঘটল।

॥ দুই ॥

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ১ জুলাই তারিখে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু তাঁর অনুসৃত খাদ্যনীতি জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ায়, ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে তিনি পরাহত হন ও অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে এক যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু তা ক্ষণস্হায়ী হওয়ায় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এক মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু তাও স্বল্পকাল স্হায়ী হওয়ায় ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে অজয় মুখার্জির অধিনায়কত্বে এক বাম ফ্রণ্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু মাত্র এক বৎসরের (ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পর্যন্ত) বেশি এ সরকার স্হায়ী হয় না। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ মার্চ তারিখে আবার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে এক ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় এবং দু'মাস (জুন ১৯৭১) পরে তা ভেঙে পড়ে। তখন (৩০ জুন ১৯৭১) আবার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়।

১৯৭২-এর মার্চ মাসে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে এক কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে 'বাম ফ্রন্ট' দল সাফল্য অর্জন করাতে জ্যোতি বসু 'বাম ফ্রন্ট সরকার' গঠন করেন। 'বাম ফ্রন্ট' সরকারই এখন পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আছে।

॥ তিন ॥

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমল থেকেই বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ১০,৪৪,১১ পাঠরত ছাত্র সমেত ১৩,৯৫০ সংখ্যক প্রাইমারী স্কুল ছিল। ১৯৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে ওই সংখ্যা বেড়ে ২৮,৮৬,১৪২ পাঠরত ছাত্র সমেত ২৮,০১৬ প্রাইমারী স্কুলে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ৪,৫৭,৬৩৪ পাঠরত ছাত্র বিশিষ্ট ছেলেদের জন্য ১,৬৬৩ স্কুল ও ৬৪,৮৬৬ পাঠরত ছাত্রী সমেত ২৪০টি মেয়ে স্কুল ছিল। ১৯৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৪৯৭ ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৩ লক্ষ। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা নয়টি যথা (বন্ধনীর মধ্যে প্রতিষ্ঠার তারিখ)— কলিকাতা (১৮৫৭), বিশ্বভারতী (১৯৫১), যাদবপুর (১৯৫৫), বর্ধমান (১৯৬০), কল্যাণী (১৯৬০), নর্থবেঙ্গল (১৯৬২), রবীন্দ্রভারতী (১৯৬২), বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪) ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৪)। এছাড়া, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটও বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ হ্রাসের জন্য ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়। পর্ষদই এখন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ মাত্র স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা গ্রহণ করে।

॥ চার ॥

শিক্ষার ক্ষেত্রে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা নীচের টেবিল থেকে বুঝতে পারা যাবে ঃ—

বিদ্যায়তন	১৯৭৭ সংখ্যা	১৯৯২ সংখ্যা
প্রাইমারী স্কুল	৪০,৯৪১	৫১,০২১
মাধ্যমিক স্কুল	৭,৮৭৪	৮,৪৪৩
উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	৬৯৫	১,৫৭৪
সাধারণ কলেজ	২২৫	৩১৫

১৯৯২ সালে প্রাইমারী স্কুলে পাঠরত ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯২,০০,০০০ ; মাধ্যমিক স্কুলে ৬৯,০৩,৭৫৪ ; উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ২,৮৫,৮১১ ও কলেজ সমূহে ২,৬২,৭০০ ।

বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে গ্রামীণ স্বায়ত্ব-শাসনকে আবার সঞ্জীবিত করা হয়েছে। বর্তমানে ১৬টি জিলা পরিষদ, ৩২৮টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ৩,২৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। শহরাঞ্চলে আছে ১১২টি মিউনিসিপালিটি ।

সেচের উন্নতির জন্য বামফ্রণ্ট সরকার তিস্তা পরিকল্পনা (১৯৮২) গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, সেচের জন্য নদী থেকে জল-উত্তোলনের জন্য ২,৬৯৭টি স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, আছে ৫,৭০১টি নলকূপ ও ৮,৫১,১৮২ হেকটর পরিমিত জমিতে জলসেচের জন্য সরকারী খাল। তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্য সাওতালডি, ব্যাণ্ডেল, দুর্গাপুর ও টিটাগড়ে নতুন শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তড়িৎশক্তির নিষ্ক্রিয়তার ফলে তার সুফল কৃষক বা জনগণ কেউই পাচ্ছে না। হলদিয়ায় নতুন বন্দর নির্মিত হয়েছে। কিন্তু কলকাতা বন্দরের হাল ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। হুগলি নদীর ওপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতাকে বেষ্টন করে চক্র-রেল চালু করা হয়েছে। পাতাল রেলেও লোক চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। এসব ছাড়া, ক্রীড়ামোদীদের সুবিধার্থে ইডেন গার্ডেন ও সল্ট লেকে স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনের জন্য 'বাংলা আকাদেমী' নামে এক নতুন সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। কয়েকটা মঞ্চও স্থাপিত হয়েছে।

সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম

দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর পূর্ব-বাঙলা পূর্ব-পাকিস্তান নাম গ্রহণ করে। কিন্তু গঠিত হওয়ার সময় থেকেই পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তানের শোষণ নীতির লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। তাদের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য পূর্ব বাঙলার জনগণ এটা বরদাস্ত করতে পারল না। তারা বেশি ক্ষুব্ধ হল যখন সরকারী কর্ম-ক্ষেত্রে, ও সৈন্যবাহিনী, নৌবহর ও বিমান বাহিনীতে পশ্চিম-পাকিস্তানিদেরই প্রাধান্য দেওয়া হল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিরাই আধিপত্য করতে লাগল। এর ফলে পূর্ব-বাঙলার মানুষ হতাশায় আক্রান্ত হয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানের বিরোধী হয়ে উঠল।

পূর্ব-বাঙলার জনগণের এই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব চরমে উঠল যখন পশ্চিম-পাকিস্তান পূর্ব-বাঙলায় রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে বাংলার পরিবর্তে উর্দু ব্যবহারের অভিযান শুরু করল। পূর্ব-বাঙলার বুদ্ধিজীবী মহল এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল। পশ্চিম-পাকিস্তানি সরকার তখন বুলেটের সাহায্যে এই প্রতিবাদ দমন করবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে সম্মত হল।

॥ দুই ॥

সূচনায় মুসলিম লীগের অধিনায়কত্বে যে সরকার পূর্ব-বাঙলায় কায়েম করা হয়েছিল, তা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত দলের কাছে ১৯৫৪ সালে পর্যুদস্ত হল। আওয়ামী দলের নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকারকে ১৯৫৯ সালে উচ্ছেদ করা হয়, যখন জেনারেল আয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করে পাকিস্তানের উভয় অংশকে সামরিক শাসনাধীনের অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতি আয়ুব খানকে আসন-চ্যুত করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করে পাকিস্তানের শাসক হন। পরে ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করেন।

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব-বঙ্গে এক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনেই আওয়ামী লীগের স্বাধিকার সম্বন্ধে ছয়-দফা সনদ সম্বন্ধে গণভোট নেওয়া হয়। সর্বত্রই আওয়ামী দলের জয় জয়কার হয়। এর ফলে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনের পর শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খানের কয়েক দফা বৈঠক ও আলোচনা হয়। এসব বৈঠক ও আলোচনার ফলে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ৩ মার্চ তারিখে ঢাকায় জাতীয় সংবিধান পরিষদের প্রথম অধিবেশন হবে। কিন্তু ১ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া খান হঠাৎ ওই অধিবেশন অনিশ্চিতকালের জন্য মুলতুবী রাখা ঘোষণা করেন। তারপর ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে শেখ মুজিবর রহমনের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ২৫ মার্চ তারিখে তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যান। এরই পদাঙ্কে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এক নির্মম হত্যাকাণ্ড। আমেরিকার 'টাইম' পত্রিকায় ডন কগিন লেখেন—'পাক সৈন্যবাহিনী এ-সময় শ্লোগান দেয় 'মারো শালা জারজ সন্তানদের মারো' ('kill the bastards')। 'একমাত্র ২৫ তারিখের রাত্রে দশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। বুদ্ধিজীবীদের মেরে ফেলা হয়, মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও অগণিত সরকারী ও বেসরকারী ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়।' ('টাইম' পত্রিকা)। এই নারকীয় অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রায় দশ হাজার শান্তিপ্রিয় পূর্ববঙ্গের নাগরিক ভারতে এসে আশ্রয় নেয়।

।। তিন ।।

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের জনগণ মুক্তি সংগ্রাম শুরু করে দেয়। ৩১ মার্চ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংগ্রামীদের প্রতি

গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন যে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে সংগ্রামীদের জয় সুনিশ্চিত। তিনিই সংগ্রামী পূর্ববঙ্গের নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ' যা আজও রয়ে গিয়েছে।

মুক্তিকামী সংগ্রামীরা অঞ্চলের পর অঞ্চল সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করে। এই সময় পাক সৈন্যবাহিনী ভারতীয় সীমান্তের মধ্যে প্রবেশ করে ভারতীয় নাগরিকদের ওপরও অত্যাচার শুরু করে। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর তারিখে পাক বিমানবাহিনী ভারতের অন্তর্ভুক্ত বয়রা গ্রামে এসে বোমা নিক্ষেপ করে। এই সময় তারা পশ্চিম ভারতের ছয়টি রাজ্যের মধ্যেও বিমান আক্রমণ করে। এদের প্রতিহত করবার আদেশ দেওয়া ছাড়া ভারতের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। পাকিস্তান এই সময় আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৪ দিন ধরে প্রচণ্ড লড়াই চলে। পাকিস্তান অঞ্চলের পর অঞ্চল হারাতে থাকে। ভারতের সার্বিক জয় হয়। ১৪ ডিসেম্বর তারিখে পূর্ববঙ্গে অবস্থিত পাক সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। দু'দিন পরে পশ্চিম ভারতের লড়াইও স্তব্ধ হয়। বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়। ঢাকা সে রাষ্ট্রের রাজধানী হয়। মুজিবর রহমানকে এই নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়। তাঁকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি সরাসরি লণ্ডন চলে যান। ১০ জানুয়ারী তারিখে তিনি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। বাংলাদেশকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে যে নতুন সংবিধান রচিত হয়, তাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়। এই সংবিধান ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর তারিখ থেকে বলবৎ হয়।

॥ চার ॥

১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী তারিখে শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেন এবং এক উপদেষ্টা সংসদের সহায়তায় শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। বাংলাদেশ কৃষি-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (BKSAL) ব্যতীত আর সমস্ত রাজনৈতিক দল রদ করা হয়। কিন্তু ওই ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট তারিখে সংসদীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর

সদস্য খোন্দকার মুস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে এক দল মুজিবর রহমানকে তার সমগ্র পরিবারসহ হত্যা করে। ২০ আগস্ট তারিখে বাংলাদেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দল রদ করা হয়।

১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর তারিখে মেজর-জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রধান 'সামরিক শাসক' নিযুক্ত হন। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২২ এপ্রিল তারিখে এ. এম. সায়েম রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করেন এবং মেজর-জেনারেল জিয়াউর রহমন নতুন রাষ্ট্রপতি রূপে শপথ গ্রহণ করেন। এক সাধারণ নির্বাচনে এটা সমর্থিত হয় এবং ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে।

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে সৈন্যবাহিনীর একদল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে এক সাধারণ নির্বাচনে তিনিই রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিজয়ী হন। কিন্তু ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে আবদুস সাত্তারকে অপসারিত করে লেফটানেণ্ট জেনারেল হোসেন মহম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের প্রধান সামরিক শাসক হন। সংবিধান রহিত করা হয় ও সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। পরের বৎসর ২৭ মার্চ তারিখে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে আমানুদ্দিন চৌধুরীকে অ-সামরিক রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর লেফটানেণ্ট জেনারেল এরশাদ নিজেই রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক শাসক হন। ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী সামরিক শাসন শিথিল করা হয় এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে লেফটানেণ্ট জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকেন। ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ তারিখে আবার সামরিক শাসন জারি করা হয়। ২১ মার্চ তারিখে এক গণভোটে (referendum) লেফটানেণ্ট জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি পদে বৃত থাকার সমর্থনে জনগণের আস্থা লাভ করেন। ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকেন। ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে এক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন।

॥ পাঁচ ॥

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় বাংলাদেশের যে অবস্থা ছিল, আজ আর তা নেই। আজ আশমান-জমিন ফারাক হয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে। এই দুই ক্ষেত্রেই আজ প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। দেশবিভাগের সময় বাংলাদেশ মোটামুটি কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। কিন্তু আজ শিল্প ক্ষেত্রেও তার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

যে বাংলাদেশে আগে কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প ছিল না, সেই বাংলাদেশে আজ চটকল, কাপড়ের কল, চিনির কল, দিয়াশালাইয়ের কল, কাঁচ তৈরির কল, কাগজ কল, মোজাগেঞ্জির কারখানা, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প ইত্যাদি নানারকমের শিল্প স্থাপিত হয়েছে। একটা সিমেণ্ট শিল্পও স্থাপিত হয়েছে, যার বাৎসরিক উৎপাদন শক্তি হচ্ছে ২০ লক্ষ টন। চট্টগ্রামে একটা ইস্পাত নির্মাণ শিল্প সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার বাৎসরিক উৎপাদন শক্তি হচ্ছে ২৫০,০০০ টন। এ ছাড়া তৈল পরিশোধনের জন্য একটা রিফাইনারীও স্থাপিত হয়েছে, যার শক্তি হচ্ছে ১৬,৮০,০০০ টন তৈল পরিশোধন।

এসব ছাড়াও একটা নিউজপ্রিণ্ট ফ্যাক্টরি, চারটা ফারটিলাইজার সার উৎপাদন ফ্যাক্টরি, একটা তরল প্রাকৃতিক গ্যাস প্ল্যাণ্ট ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে। জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য একটা শিপ-ইয়ার্ডও স্থাপিত হয়েছে। ১৯৮২ সালে যে নতুন সরকারী শিল্পনীতি ঘোষিত হয়েছে, সেই নীতি অনুযায়ী চটকল ও কাপড়ের কলগুলিকে সরকারী মহল থেকে মুক্ত করে বেসরকারী মহলের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলা হয়। তবে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, গোলাবারুদ তৈরি, আণবিক শক্তি, বিমান-পরিবহন, যোগাযোগ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, বনজ শিল্প ইত্যাদি সরকারী মহলের হাতেই আছে। বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ও পরিবেশন 'বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড' ও 'রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড' দ্বারা সাধিত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস তিতাস থেকে পাওয়া যায় এবং পাইপের সাহায্যে ঢাকায় আনীত হয়। অন্যান্য জায়গাতে ড্রিলিং কার্য চালানো হচ্ছে এবং অনুমিত হয়েছে যে প্রাকৃতিক গ্যাসের যে

রিজার্ভ আছে তা অন্ততঃ ২00 বৎসরের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। বঙ্গোপসাগরেও ড্রিলিং চালিয়ে তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। জামালপুর জেলায় কয়লারও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কয়লার সংরক্ষিত ভাণ্ডার ৭0 কোটি টন আছে বলে অনুমিত হয়েছে। রাজশাহী জেলাতেও কয়লার গভীর স্তর আছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থের মধ্যে লবণ, চুনাপাথর, সাদামাটি (white clay) ও কাঁচ তৈরির বালি আছে। ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দে সৌদি আরবের কাছ থেকে প্রাপ্ত তিন কোটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলার পরিমাণ অর্থের সাহায্যে জয়পুরহাটে একটি চুনাপাথর ও সিমেণ্ট কারখানার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গোপসাগর ও দেশের অভ্যন্তরস্থ অসংখ্য নদনদী ও খাল-বিল মৎস্য চাষের সহায়ক হয়েছে এবং সমুদ্র ও এই সকল অভ্যন্তরস্থ নদ-নদী ও খালবিল থেকে ১৯৮0-৮১ সালে ৬৪0,000 টন মৎস্য সংগৃহীত হয়েছিল।

অন্যান্য যে সকল শিল্পের কথা উপরে বলা হয়েছে ১৯৮৩-৮৪ সালে তাদের উৎপাদন ছিল—চট ও থলে ৩৩৫,000 টন, ইস্পাত পিণ্ড ১৩৭,000 টন, ইস্পাত নির্মিত দ্রব্য ১৯৪,000 টন, পরিশোধিত চিনি ১৫১,000 টন ও নিউজপ্রিণ্ট ৩0 লক্ষ টন। ১৯৮২ সালে শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধি-হার ছিল পাঁচ শতাংশ। ১৯৮১-৮২ সালে শিল্পে কর্মরত ছিল মোট জন-সংখ্যার সাত শতাংশ লোক। GNP পরিমাণ ছিল ৮.0৮ শতাংশ।

বাংলাদেশের মোট GDP-র ৫৪ শতাংশ পাওয়া যায় কৃষি থেকে। বাংলাদেশের টাকায় এর মূল্য পরিমাণ হচ্ছে ৩৭৫১.২ কোটি টাকা। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮0 শতাংশ কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকে। দেশের মোট আয়তনের ৬৪ শতাংশে চাষবাস করা হয়। তার মধ্যে ৮0 শতাংশে ধান ও নয় শতাংশে পাটের চাষ হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে ধানের উৎপাদন ছিল এক কোটি ৪৬ লক্ষ টন, পাট ৫২ লক্ষ টন, ইক্ষু ৬৯,৮৬,000 টন, গম ১১,৯১,000 টন, তামাক ৫১৭,00,000 টন, চা ৯,৫0,00,000 পাউণ্ড, ও আলু ১,১৫,00,000 পাউন্ড। পাট থেকেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতির দুর্বলতা হচ্ছে ঘন ঘন নৈসর্গিক দুর্যোগ ও উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সেজন্য বাংলাদেশ আজ খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।

।। ছয় ।।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের ইদানীং যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। মোট সংখ্যার ২৪ শতাংশ সাক্ষর। ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র বাংলাদেশে ৪৩,৬৩৪ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮,৯৪৬ মাধ্যমিক স্কুল ও ৬০০ ইনটারমিডিয়েট ও ডিগ্রি কলেজ ছিল। ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৮০ লক্ষ, মাধ্যমিক স্কুলসমূহে ২০ লক্ষ, টেকনিকাল কলেজসমূহে ১৬,০০০ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ৩০,০০০। মোট ছয়টা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তার মধ্যে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও একটি কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষার জন্য। বাকি চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতি হচ্ছে ঢাকা, রাজসাহী, মৈমনসিংহ ও চট্টগ্রামে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ১৪টি কলেজ আছে। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৪৭টি বিদ্যায়তন আছে। ১৬টি পলিটেকনিক ও ২৬টি পেশাগত বিদ্যায়তনও আছে।

বাংলাদেশে ৫৩টি দৈনিক পত্রিকা, ২০০ সাপ্তাহিক পত্রিকা, ৩৪টি পাক্ষিক, ১৯৪টি মাসিক ও ৪৩টি ত্রৈমাসিক পত্রিকা আছে। অধিকাংশ পত্রিকাই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক বার্তা-আল রাজশাহী' নামে একটি সরকারী পত্রিকাও আছে।

বাংলাদেশ আজ অসাধারণ নিষ্ঠা দেখাচ্ছে সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের মনীষীরা আজ যে-সব সৎসাহিত্য সৃষ্টি করছে, পশ্চিমবঙ্গে তা বিরল। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য আজ অপসংস্কৃতি ও গোষ্ঠীতোষণের শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের না আছে সংগ্রামী মন, না আছে আত্মপ্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত সুসংহত ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা। অথচ সাহিত্যের প্রধান ধর্ম হচ্ছে সমাজকে বিপথ থেকে ঠিক পথে নিয়ে যাওয়া। সে সাফল্য পশ্চিমবঙ্গের চলমান সাহিত্য অর্জন করতে পারে নি। সেদিক থেকে বাংলাদেশের চলমান সাহিত্য সাফল্যমণ্ডিত ও সম্ভাবনাময়। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনীষীরা, বাংলা একাডেমী ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমী যা করছে, তা বিস্ময়কর।

ঢাকার বাংলা একাডেমীর প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেখলে চমকে যেতে

হয়। এঁরা অগণিত বই বের করেছেন, নানা বিষয়ে যথা—অভিধান, পরিভাষা, গল্প-উপন্যাস, কবিতা, রচনাবলী, একুশের সংকলন, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য, লোকসাহিত্য, নাটক, শিশু-কিশোর সাহিত্য, ইতিহাস-সংস্কৃতি, জীবনী, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোক প্রশাসন, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, সাংবাদিকতা, চিত্রকলা, গণিতশাস্ত্র, পরিসংখ্যান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ভূগোল, ভূতত্ব ও মৃত্তিকাবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরিবিদ্যা, সাধারণবিজ্ঞান, স্বাধীনতা সংগ্রাম, অফিস-আদালত, ধর্ম ও সঙ্গীত। এসব বিষয়ে এঁরা আজ পর্যন্ত কয়েক শত বই বের করেছেন।

সবশেষে বলতে চাই বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে। শিশু ও কিশোরদের জন্য এঁরা যে সব বই বের করেছেন সেগুলি অপূর্ব। নিঃসন্দেহে বলি যে বাংলাদেশের প্রকাশকরাও আজ অসামান্য কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন বাংলাদেশের মনীষীগণের চিন্তাশীল রচনাসমূহ সুরুচির সহিত প্রকাশ করে।

বাঙালী জীবনচর্যার পরিবর্তন

গত ১০০ বছরে বাঙালী হারিয়েছে তার স্বকীয় জীবনচর্যা। কলকাতার লোক যে জীবনচর্যা অনুসরণ করে, তাই আজ বাঙলার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছে। কলকাতার লোকের জীবনচর্যার রূপান্তর ঘটেছে গত ১০০ বছরে। শহরে সমাজ, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পালা-পার্বণ ও জন-সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে। অথচ, আমরা ইতিহাসে দেখি যে যারা প্রথম গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিল তারা গ্রামকেই শহরে তুলে নিয়ে এসেছিল। গ্রামীণ ধর্মকর্ম কলকাতায় অনুসরণ করা যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য তারা সঙ্গে করে এনেছিল তাদের বামুন-পুরুত, নাপিত ইত্যাদি। সঙ্গে করে তারা আরও নিয়ে এসেছিল গ্রামের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা। তখনকার কলকাতার গ্রাম্যরূপ, তাদের এখানে গ্রামীণ জীবনচর্যা অনুসরণ করাকে সহজতর করেছিল। কিন্তু ক্রমশ শহরের বিবর্তন, তাদের এটা ব্যাহত করে।

॥ দুই ॥

গ্রামীণ সমাজ যা শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তা প্রথম আঘাত পায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শহরে এক 'অভিজাত' সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে। শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রথম সাধারণ লোককে প্রভাবান্বিত করেনি। সাধারণ লোক নিষ্ঠাবান ও গ্রামীণ সংস্কৃতিরই ধারক রয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিটাই বিগত চোদ্দ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বজায় ছিল, বিশেষ করে পালা-পার্বণ, ধর্মকর্ম ও সামাজিক, আচার-বিচারে। গোড়ার দিকে গ্রামের লোক যে-সব অপপ্রথা (যথা সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি) সঙ্গে করে শহরে নিয়ে এসেছিল সেগুলো বিগত চোদ্দ শতাব্দীর সূচনার আগেই বিলুপ্ত হয়েছিল।

এই সব অপপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সার্থকতা লাভ করেছিল মুদ্রিত পুস্তক দ্বারা প্রচারের মাধ্যমে ও ইংরেজের প্রণীত আইনের সহায়তায়।

মুদ্রিত বইয়ের প্লাবন শিক্ষাজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা ত্বরান্বিত হয়েছিল যখন ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর শহরের নানাস্থানে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। ফলে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হয়। এই সমাজের ছেলেরা নানারকম পেশা গ্রহণ করে। কেউ হন ডাক্তার, কেউ আইনবিদ, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বিজ্ঞানী ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ পত্তন করল এক নতুন সাহিত্যের। সাহিত্যক্ষেত্রে আবিভূত হলেন বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও আরো অনেকে। তাঁদের লেখা ভাষাই কলকাতার ভাষা তথা বাংলা ভাষার মানরূপে গৃহীত হল। এই সাহিত্যেরই দিক্পাল হিসাবে বিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভুষণ ও নজরুল।

মধ্যবিত্ত সমাজের যাঁরা পেশা গ্রহণ করল না, তারা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে কর্ম গ্রহণ করল। সীমিত-দায়-যুক্ত যৌথ মূলধনী কোম্পানি আইন বিধিবদ্ধ (১৮৫০) হবার পর ম্যানেজিং এজেন্টসমূহ স্থাপন করলেন চটকল, কয়লাখনি, চা-বাগিচা, ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি। কলকাতা একটা বিরাট কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ স্থাপন শহরতলির লোকদের কলকাতার কর্মকেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে এল। তারা কলকাতা-সমাজের সংস্কৃতি গ্রামে নিয়ে গেল। এ ভাবে নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে গ্রামীণ সভ্যতার একটা যোগসূত্র স্থাপিত হল।

কলকাতায় যে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব হল, তাদের পুরুষরা ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে যদিও উদারনীতিক হলেন তাঁদের অন্দরমহলের মেয়েরা কিন্তু রক্ষণশীলা থেকে গেলেন। যদিও ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন স্কুল স্থাপিত হবার সময় থেকে স্ত্রীশিক্ষার কিছু কিছু প্রসার ঘটেছিল, তা হলেও যে-সব মেয়ে স্কুলে পড়তে যেত (অধিকাংশই দশ বছরের কম) তাদের রক্ষণশীলতা বজায় রেখে ঢাকা গাড়িতে করে স্কুলে যেতে হত।

দশ বছর বয়সের আগেই হিন্দু মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত, সেজন্য তাদের উচ্চ শিক্ষালাভের কোন সুযোগ ছিল না। দু-চারজন স্কুলে যেত। তারা ব্রাহ্ম পরিবারের কিংবা ক্রিশ্চান পরিবারের মেয়ে। ১৯২৯

খ্রীস্টাব্দে সরদা আইন দ্বারা যখন মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স স্থির করা হয়, তখন থেকেই হিন্দু মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রবণতা প্রকাশ পায়। তারা শিক্ষাক্ষেত্রের নানাবিভাগে পুরুষদের তুলনায় যথেষ্ট এগিয়ে যেতে থাকে। যে রূপান্তরটা গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঘটেছে, তা একেবারে অবিশ্বাস্য। আজ নামজাদা মহিলা ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, অধ্যাপিকা, ম্যাজিস্ট্রেট, সাংবাদিক, কোম্পানি এগ্‌জিকিউটিভ শহরের সর্বত্রই আকছার দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা হাইকোর্টে আজ কয়েকজন মহিলা বিচারপতিও নিযুক্ত হয়েছেন। বাঙালী মেয়েরা আজ বিশ্বসুন্দরী খেতাবও পাচ্ছে। অথচ পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এঁদেরই মা-মাসি-পিসিদের দশ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যেত।

॥ তিন ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত মধ্যবিত্ত হিন্দু-সমাজের অন্দরমহল অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল। সেটাই ছিল হিন্দুরক্ষণশীলতার দুর্গ। যার কোনো ট্রাডিশন্যাল ধারাবাহিকতা ছিল না, তা ছিল মেয়েদের কাছে অপকর্ম। সেই মানদণ্ড দিয়েই তারা পাপ-পুণ্য বিচার করত। বাড়ির বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির অন্দরমহলেও তারা বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়াতো। পরপুরুষের সামনে বেরুনো একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ভাসুর-ভাদ্দর-বৌ-এর সম্পর্কের মধ্যে ছিল চৈনিক প্রাচীর। সেই সব মেয়েদের নাতনীরাই আজ ভাসুরের সঙ্গে কথা বলে এবং সিনেমায় ও খেলার মাঠে গিয়ে পাশাপাশি বসে। তখনকার দিনে কথা বলা তো দূরের কথা, ঘোমটার ভিতর থেকে দেখতে না পেয়ে দৈবাৎ যদি ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেত, তা হলে ধান-সোনা উৎসর্গ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এখন আর ভাসুর-ভাদ্দর বউয়ের মধ্যে সে নিষিদ্ধ সম্পর্ক (taboo) নেই। সম্পূর্ণ খোলামেলা ভাবেই তারা মেলামেশা করে।

বিবাহের পর থেকেই সেকালের লোকের ধর্মীয় জীবন শুরু হত। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কুলগুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিত। কেননা সেকালের মেয়েদের সংস্কার ছিল যে মন্ত্র না নিলে দেহ পবিত্র হয় না। যারা মন্ত্র

নিত, তাদের প্রতিদিনই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হত। যাদের মন্ত্র হয়নি, তাদের ঠাকুরঘরে যেতে দেওয়া হত না। এমন কি শ্বশুর-শাশুড়ীও তাদের হাতের পক্কান্ন শুদ্ধ বলে মনে করত না।

সেকালের মেয়েরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সদর দরজা থেকে শুরু করে বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত সর্বত্র গোবরজলের ছিটা দিত। সাধারণ গৃহস্থলোকের বাড়ি দুমহল হত। ধনী লোকদের বাড়ি তিনমহল চারমহলও হত। প্রতি বাড়িতেই তুলসীমঞ্চ থাকত এবং সন্ধ্যাবেলা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জেলে দেওয়া হত। তা ছাড়া, বোশেখ মাসে তুলসীগাছের ওপর একটা জলপূর্ণ পাত্র বেঁধে 'ঝারা' দেওয়া হত।

সেকালের মেয়েদের ধর্মবিশ্বাস এখনকার মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। শিশুকাল থেকেই নানারকম ব্রত পালনের ভিতর দিয়ে তাদের ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠত ও মনের মধ্যে পাপ-পুণ্যের একটা ভাব সঞ্চারিত হত। পাঁচ থেকে আট বছরের মেয়েরা নানারকম ব্রত করত; যেমন বোশেখ মাসে শিবপুজো ও পুণ্যিপুকুর, কার্তিক মাসে কুলকুলতি, মাঘমাসে মাঘমণ্ডল ইত্যাদি। সধবা মেয়েদের ব্রতের অন্ত ছিল না। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন কলসী উৎসর্গ করা হত। কার্তিক মাসে আকাশ-প্রদীপ দেওয়া হত। এ সবই পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত কলকাতায় পালিত হয়। বাঙালীর বার মাসে তের পার্বন ছিল, তার অধিকাংশই আজ উঠে গিয়েছে।

আগে ঘেঁটুপুজোর খুব ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু আজকাল ছেলেদের মধ্যে খোষপাঁচড়ার প্রকোপ কমে গিয়েছে বলে ঘেঁটুপুজোর আর চলন নেই। অরন্ধনও একটা বড় পরব ছিল এবং এই উপলক্ষে পাঁচ বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করা হত; পৌষপার্বণে পিঠেপুলি তৈরির ভীষণ ঘটা হত। তখনকার কালে গ্রহণের দিন লোক হাঁড়ি ফেলে দিত। রান্নার জন্য আবার নতুন হাঁড়ি ব্যবহার করত। দশহারার দিন ফলাহার করত। অরন্ধনে আগের দিনের রান্না ভাত তরকারি খেত। শ্রীপঞ্চমীর দিন কড়াই সিদ্ধ করত, পরদিন শীতলা ষষ্ঠীর দিন তা খেত। চৈত্র সংক্রান্তিতে যবের ছাতু খেত। শীতলা অষ্টমীর দিন শীতলাতলায় গিয়ে বনভোজন করত।

সেকালে বর্ষীয়সী মহিলারা নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন। তারা

অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন বলে ভোর রাতেই গঙ্গাস্নানে বেরুতেন ও সূর্যোদয়ের পূর্বেই বাড়ি ফিরে আসতেন। ধনী পরিবারের মহিলারা পালকি করে গঙ্গাস্নানে যেতেন, এবং গঙ্গার ঘাটেও পালকি থেকে নামতেন না। পালকিটাকে জলে নামিয়ে দেওয়া হত এবং তাঁরা পালকির ভিতরেই স্নান সেরে নিয়ে বস্ত্র পরিবর্তন করতেন।

॥ চার ॥

ধর্মীয় পরবগুলির ন্যায় সামাজিক উৎসবগুলির মধ্যেও অনেকগুলি উঠে গিয়েছে। আজকালকার দিনে মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হয়; সেজন্য রজঃঅনুষ্ঠান উঠে গিয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত এটা একটা বড় সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। অনুরূপভাবে আজকাল মেয়েরা হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে প্রসব করে বলে, আটকৌড়ে ও চারকৌড়ে উঠে গিয়েছে। ষেটেরাপুজোও লুপ্ত হয়েছে। ষষ্ঠীপুজা এখনো আছে। মেয়েদের সাধভক্ষণ ইত্যাদি কোন কোন জায়গায় পালিত হয়, কোন কোন জায়গায় হয় না। আগেকার দিনে এগুলো বড় সামাজিক উৎসব ছিল ও অনেক আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হতেন। রজঃদর্শন উৎসবে নাচগানও হত।

অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্নপ্রাশন এখনো হয়, কিন্তু সেটা অন্য রূপ নিয়েছে। ব্রাহ্মণদের উপনয়ন এখনো হয়, যদিও অনেকক্ষেত্রে যথাসময়ে নয়। বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও স্ত্রী-আচারসমূহ এখনো পালিত হয়, যদিও এগুলো সংক্ষিপ্ত হয়েছে। ছাঁদনাতলায় নাপিতদের ছড়াকাটা কোনো কোনো জায়গায় হয়, কোনো কোনো জায়গায় হয় না। আজকালকার নাপিতরা আগেকার দিনের সে সব ছড়া ভুলেও গিয়েছে। বিবাহ উপলক্ষে নাড়ুভাজা ইত্যাদি (যার বর্ণাঢ্য বর্ণনা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী তাঁর 'বাংলার স্ত্রী আচার' বইয়ে দিয়েছেন) উঠে গিয়েছে। বিবাহ সম্পর্কে আগেকার অনেক সামাজিক রীতি উঠে গিয়েছে। তা ছাড়া আগেকার দিনে সবর্ণেই বিবাহ হত; এখন অসবর্ণ বিবাহ প্রায়ই হচ্ছে। ষাট বছর আগে পর্যন্ত কর্মবাড়িতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের জন্য আলাদা পংক্তি হত। তা ছাড়া ব্রাহ্মণরা ভোজন-দক্ষিণা পেতেন। আজ আর পান না। এখন ব্রাহ্মণরা সকলের সঙ্গে একই

পংক্তিতে খান।

শ্রাদ্ধের ঘটাও এখন অনেক কমে গিয়েছে। আগে নিয়মভঙ্গের দিন সর্বজনীন নিমন্ত্রণ করা হত। এখন মাত্র জ্ঞাতি ও নিকট-আত্মীয়দেরই করা হয়। তা ছাড়া, যারা ব্রাহ্মণ নয়, তারা অশৌচকাল ত্রিশ দিন থেকে দশ-পনেরো দিনে নামিয়ে এনেছে।

শিক্ষারম্ভ বা হাতেখড়ি দেওয়া প্রথা এখন উঠে গিয়েছে। নামকরণের বেলাতেও তাই। আগেকার দিনের অনেক নাম এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, যেমন গদাধর, জলধর, জগন্নাথ, পীতাম্বর, এককড়ি, দুকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি ইত্যাদি। মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। এখন আর কেউ মেয়ের নাম রাখে না থাকমণি, পরশমণি, এলোকেশী, জগদম্বা, মহামায়া, কালীমতি ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে পোশাক-আশাকে ও প্রতিবেশীর সঙ্গে আচার ব্যবহারে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সাধারণ লোক মাথায় শিখা রাখত ও ধুতি-চাদর ব্যবহার করত। মাথায় পাগড়ি বাঁধত। সেলাইবিহীন বসন ব্যবহার করা বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল। শার্ট কামিজ পিরান ব্যবহার ছিল না। মেয়েদের গোড়ায় কোনো অন্তর্বাস বা উত্তরবাস ছিল না। শাড়ীখানাই উপরের অঙ্গে জড়িয়ে রাখত। অন্তর্বাস ছিল না বলে মেয়েরা পাছাপাড় কাপড় পরত। পাছাপাড় কাপড় পরা বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের পর থেকে উঠে গিয়েছে। ছোটো ছেলেমেয়েদের হাফপ্যাণ্ট পরা রীতি ছিল না। ছেলেরা পাঁচ-সাত বছর বয়স পর্যন্ত দিগম্বর থাকত। তারপর পাঁচহাতি কাপড় পরত। ছোটো মেয়েরা প্রথমে ফ্রক পরল ও বয়স্ক মেয়েরা অন্তর্বাস ও উত্তরবাস হিসাবে প্রথম শেমিজ, তার পর শায়া, জ্যাকেট ও ব্লাউজ। নিমন্ত্রণ বাড়ি যাবার সময় একটা ভেলভেটের জ্যাকেট ও বেনারসী শাড়ী পরত। মেয়েরা এখন আবার অনেকে পাজামা, কামিজ ও সালওয়ার পরে। কেউ কেউ আবার প্যাণ্টও পরে। ম্যাকসি পরাও ফ্যাশান হয়েছে। আবার অনেকে সিগারেট খায়। উত্তরবাস ও অন্তর্বাসের একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু বাকিগুলো কি? পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত পুরুষরা চটিজুতা পরত। আপিস যাবার সময় কেউ কেউ চীনা বাড়ির বার্নিস করা জুতা পরত। মাত্র উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই প্যাণ্ট কোট ও ওয়েস্টকোট পরত। তাদের টুপিও পরতে হত। সাধারণ বাঙালীর প্যাণ্ট ও লুঙ্গি পরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে শুরু হল।

হাওয়াই শার্টের চলনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান। ছেলেবেলায় পুজোর সময় আমাদের পোশাক কেনা হত দেশী তাঁতের ধুতি ও জরির কাজ করা ভেলভেটের কোট। তা ছাড়া ছেলেরা নানারকম গহনা পরত। আর মেয়েদের গহনার তো পরিসীমা ছিল না। এক-একজন গৃহস্থ বধূর পঞ্চাশ-ষাট ভরি গহনা থাকত। থাকবেই বা না কেন? সোনার ভরি তো ছিল মাত্র আঠারো টাকা। তবে অনেক গহনা এখন উঠে গিয়েছে, যেমন কোমরে সোনার গোট, নাকে নথ ও নোলক পরা।

খেলাধুলা ও আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। হা-ডু-ডু খেলাটাই খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল। তা ছাড়া ছেলেরা নিয়মিত ব্যায়াম করত, লাঠি খেলত, কুস্তি লড়ত, সাঁতার কাটত ও মুগুর ভাঁজত। এখন এসব জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। আরো যে-সব জনপ্রিয় খেলা ছিল, তা হচ্ছে ড্যাং-গুলি, মারবেল খেলা ও ঘুড়ি ওড়ানো। এখন এসবের পরিবর্তে ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিণ্টন, হকি ইত্যাদি প্রচলিত হয়েছে। এখন খেলার মাঠে বাঙালী ছেলে ও মেয়েরা অসাধারণ দক্ষতা দেখাচ্ছে। আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে তরজার লড়াই, পুতুল নাচ, যাত্রা প্রভৃতি প্রায় উঠেই গিয়েছে। যাকে এখন যাত্রা-অভিনয় বলা হয়, তা প্রকৃত সেকালের যাত্রাভিনয় নয়। থিয়েটার এখনো আছে, তবে সিনেমা বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। সিনেমার ছবির পরিচালনায় সত্যজিৎ রায় বিশ্ব-পুরস্কার Oscar পেয়েছেন। তা ছাড়া রেডিও এবং টি ভি থেকেও শহরবাসীরা বেশ আমোদ পাচ্ছে। বাড়ির ভেতরের খেলার মধ্যে এক্কা-দুক্কা, লুকোচুরি ইত্যাদি খেলা উঠে গিয়েছে। দশ-পঁচিশ খেলাও তাই। তার পরিবর্তে ক্যারাম, লুডো, স্নেক-অ্যাণ্ড ল্যাডারস ইত্যাদি স্হান পেয়েছে। বয়স্কদের মধ্যে দাবা ও পাশাখেলা এখনো কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। তবে তাসখেলার ক্ষেত্রে রঙের খেলার বদলে এখন 'ব্রিজ' খেলা প্রচলিত হয়েছে। এসব গ্রামেও প্রচলিত হয়েছে।

রান্নাঘরেরও পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। উনুনের স্থান অধিকার করেছে জনতা স্টোভ বা গ্যাস। মাটির হাঁড়ির পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি; পাথরের ও কাঁসার থালার পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়াম, স্টেনলেস স্টীল ও পোরসিলেনের থালা-বাসন প্রচলিত হয়েছে। আর্থিক চাপ ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মাছ খাওয়া ও নানারকম ব্যঞ্জন রাঁধা হ্রাস পেয়েছে। ফ্রিজের প্রচলনের ফলে একদিনের রান্না দু-তিনদিন খাওয়া অভ্যাস

হয়েছে।

সেকালের তুলনায় বাঙালী জীবনে আজ যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা অভূতপূর্ব। এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনকে সহায়তা করেছে মুদ্রণের প্রবর্তন, শিক্ষার প্রসার, সাহিত্যসৃজন, যন্ত্রশিল্প, পরিবহনব্যবস্থা এবং নানা প্রদেশের ও বিদেশীয় লোকের সংস্পর্শ।

কিন্তু এই অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটলেও কতকগুলো মৌলিক উপাদান এখনো রয়ে গিয়েছে, যথা ষষ্ঠী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, ইতুপূজা, জয়মঙ্গলবারের ব্রত, নবান্ন, শীতলাপূজা ইত্যাদি। এছাড়া আছে গোরুর গাড়ি ও ঘুঁটের ব্যবহার। এগুলো সবই আদি-অস্ত্রাল যুগ থেকে বাঙালী সমাজে সজীব রয়ে গিয়েছে। সেখানেই বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক চরিত্রের সূত্র ধরা পড়ে।

বাঙালী জীবনের অস্তাচল

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত বাঙালীর গৃহস্থালীতে ধামা, চুপড়ি, জাঁতা, কুলো, ধুনুচি, ঢেঁকি, হাতপাখা, হামানদিস্তা ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। বাসন-কোসনের মধ্যে প্রভূত পাথরের ও কাঁসার বাসন ছিল। পিতলের বাসনও ছিল যেমন পিতলের ঘড়া, পিলসুজ, প্রদীপ, রেকাবি ইত্যাদি। মাটির উনুনে মাটির হাঁড়িতে ভাত-ডাল রান্না হত। রান্নাঘরে দুরকম উনুন থাকত—আমিষ ও বিধবাদের জন্য নিরামিষ রান্নার জন্য। এখন আর মাটির হাঁড়িকুড়িতে রান্না করা হয় না। বাসন-কোসনও পাথর-কাঁসা-পিতলের হয় না। অ্যালুমিনিয়াম ও স্টেনলেস স্টীল তাদের জায়গা দখল করেছে। রান্না-বান্নাও আর মাটির উনুনে হয় না। কেরোসিনের স্টোভ, 'জনতা', ইলেকট্রিক বা গ্যাস উনুনে রান্না হয়।

॥ দুই ॥

রান্না ভাত কাপড়ে ঠেকলে কাপড় 'সকড়ি' হয়ে যেত। আবার কাপড় বদলাতে হত। কোনো জায়গা 'সকড়ি' হয়ে গেলে ন্যাতা-গোবর দিয়ে সে-জায়গাটা শুদ্ধ করা হত। লোক মেঝের ওপর আসন বা কাঠের পিঁড়ির ওপর বসে খেত। খাওয়া হয়ে গেলে সেই জায়গাটা ন্যাতা-গোবর দিয়ে শুদ্ধ করে ফেলত। এখন 'সকড়ি' সংস্কার ও ন্যাতা-গোবর উঠে গেছে। এ-বেলার রান্না রেফরিজেরেটারে তুলে রাখা হয়, রাত্রে বা পরদিন খাবার জন্য। তাতে রেফরিজেরেটার 'সকড়ি' হয় না। এখন মানুষ মাটির ওপর আসন বা পিঁড়ি পেতে বসে খায় না। এখন চেয়ারে বসে টেবিলে খায়। এক্ষেত্রেও টেবিল 'সকড়ি' হয় না। তাছাড়া, মেয়েরা আর শিলনোড়া নিয়ে বাটনা বাটতে বসে না। এখন গুঁড়ো মশলাতেই কাজ সেরে ফেলে। একই উনুনে আমিষ ও নিরামিষ রান্না হয়। বিধবারা স্বচ্ছন্দে তা খায়। এক কথায় আগেকার দিনের শুচিতা ও সকড়ি সংস্কার এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

লোকে আগে গামছা পরে গাড়ু হাতে করে পায়খানায় যেত। পায়খানা করবার পর গামছাটাকে কেচে ফেলত। এখন আর ওসব বালাই নেই। লোকে পরিহিত কাপড় পরেই পায়খানায় যায়। গাড়ুও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পায়খানা করবার পর 'হাতেমাটি' করার রীতিও এখন আর নেই। পায়খানায় গেলে কাপড় যে নোংরা ও অপবিত্র হয়ে যায়, এ-বোধ এখন আর নেই। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এসব পরিবর্তন ঘটছে।

মেয়েরা আগে হাতে কাঁচের চুড়ি ও কপালে কাঁচপোকার টিপ পরতে ভালবাসত। এখন হাতে রিস্ট-ওয়াচ ও কপালে সিঁদুরের টিপ পরে। মেয়েদের পায়ে মল বা তোড়াও উঠে গেছে। মেয়েরা এখন আর বুক পর্যন্ত ঘোমটা দেয় না। আগে মেয়েরা পায়ে জুতা পরত না। এখন জুতা পায়ে দেওয়া একটা মর্যাদার চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা আগে পথে বেরুত না। এখন তারা একা-একাই সিনেমা-থিয়েটার ও বাজার-হাটে যাচ্ছে। অনেকে আপিসেও যাচ্ছে চাকরির কারণে।

তিন

বাড়ির ভেতরেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বাড়ির ভেতরে সেকালে মেয়েদের দুটো বড় কাজ ছিল—পান সাজা ও প্রদীপের সলতে পাকানো। এ-দুটোর কোনটাই এখন নেই। বাড়ির ভেতর মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়াত। ভাশুর-শ্বশুর বা অন্য কোন গুরুজন সামনে এসে পড়লে সরে দাঁড়াত। ভাশুর ও মামাশ্বশুরের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে 'ধান-সোনা' উৎসর্গ করতে হত। এখন মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ভাশুর ও মামা-শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে, একসঙ্গে বসে খায় ও গা ঘেঁষাঘেষি করে সিনেমা-থিয়েটারে বসে।

প্রতি বাড়িতেই একটা করে আঁতুর-ঘর থাকত। সেখানেই বাড়ির বৌ-ঝিরা প্রসব করত। মেয়েদের একমাস অশুদ্ধ বা অপবিত্র অবস্থায় আতুর ঘরে থাকতে হত। একুশ দিন বা একমাস পরে ষষ্ঠীপুজা না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ হত না। এখন মেয়েরা হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে প্রসব করে বলে ষেটেরা পুজা, চারকৌড়ে; আটকৌড়ে ইত্যাদি উঠে গেছে।

সেকালে কোন বাড়িতে ঝি-চাকর ঢুকলে, আজীবন তারা সেই বাড়িতেই থাকত এবং বাড়ির লোকেরা তার সঙ্গে আত্মীয়তা করে তাকে 'মাসী', 'দিদি' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করত। এখন লোকে তাদের 'কাজের লোক' বলে এবং তাদের নাম ধরে ডাকে।

॥ চার ॥

এছাড়া, বাঙালীর ব্যবহারিক জীবনে আরও অনেক সংস্কার ছিল। সেকালের লোক ভিখারীকে কখনও ফিরিয়ে দিত না। তবে অশৌচকালে ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ভিক্ষা দিতে গিয়ে মেয়েরা কখনও দু-চার কণা চাল মাটিতে ফেলত না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে ভিক্ষার চাল মাটিতে পড়লে, সে কন্যাসন্তান প্রসবিণী হবে। সেকালে লোক সকালে কৃপণ বা নিঃসন্তান লোকের নাম করত না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে ওরূপ লোকের নাম করলে সেদিন তাদের অন্ন জুটবে না। যাত্রার সময় কেউ হাঁচলে, সেটাকে অমঙ্গল জ্ঞান করত এবং পুনরায় ফিরে এসে অপেক্ষা করে তারপর যাত্রা করত। তাছাড়া, লোক বিশ্বাস করত যে বাঁ চোখ কাঁপা, বা বাঁ অঙ্গ যদি নাচে, তা হলে তার ক্ষতি হবে। টিকটিকি পড়াতেও বিশ্বাস করত। আরও বিশ্বাস করত যে মঙ্গলবারে বৃষ্টি নামলে তিনদিন, আর শনিবারে নামলে সাতদিন বৃষ্টি হবে। খেতে খেতে 'বিষম' লাগলে বলত, কেউ তার নাম করছে। এছাড়া বৃহস্পতিবারে কেউ লেনদেন করত না। বৃহস্পতিবারের বারবেলাটাও সব কাজে অশুভ বলে মনে করত। শনিবারে, মঙ্গলবারে ও জন্মবারে কখনও নববস্ত্র পরিধান করত না! জন্মবারে বা জন্মমাসে কোন ক্ষৌরকর্ম বা কেশকর্তন করত না। মেয়েরাও ছেলের জন্মবারে বা জন্মমাসে নতুন কাপড় 'ভাঙত' না বা নূতন হাঁড়ি 'কাড়তো' না। রাত্রিকালে মেয়েরা চুল বাঁধত না, বা সিঁদুর পরত না ; কিংবা আয়নায় মুখ দেখত না। বলত, সেরূপ করলে কুলটা হতে হবে। দাঁড়কাক ডাকলে, সেটা খুব অমঙ্গলের লক্ষণ বলে মনে করত। দোকানীরা রাত্রে সুঁচ বেচত না। রাত্রে কাল-পেঁচা ডাকলে, সেটাকেও অমঙ্গলের লক্ষণ বলে মনে করত। এছাড়া বারবেলা, কালবেলা ইত্যাদিতে কোন শুভকর্ম করত না। একাদশীতে সধবা মেয়েদের মাছ খাওয়া অবশ্য কর্তব্য ছিল। বিশ্বাস করত যে

একাদশীতে মাছ না খেলে সে বিধবা হবে। ওইদিন মেয়েরা পায়ে আলতাও পরত। স্বামীর আগে মেয়েরা কখনও অন্নগ্রহণ করত না। স্বামী বা কোন গুরুজনের নাম উচ্চারণ করত না। নামের প্রথম বর্ণটা পরিবর্তন করে তাদের নাম করত। কেউ এক চোখ দেখালে লোকে ভাবত অপরের সঙ্গে ঝগড়া হবে। এর প্রতিরক্ষার্থে তাকে দু'চোখ বন্ধ করে দেখাতে বলা হত।

॥ পাঁচ ॥

বাঙালী সমাজের রূপান্তরটা মাত্র নাগরিক সভ্যতাকেই আচ্ছন্ন করে-নি, গ্রামীণ সভ্যতাকেও। যারা প্রথম গ্রাম থেকে শহরে বাস শুরু করেছিল, তারা গ্রামকেই শহরে তুলে নিয়ে এসেছিল। আজ তার বিপরীত প্রক্রিয়া চলছে। আজ গ্রামের লোকরাই শহরকে গ্রামে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। নাগরিক সভ্যতার চটক আজ গ্রামের লোকের মনকে আচ্ছন্ন করেছে। ফলে বাঙালী তার স্বকীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। কিসের বিনিময়ে? পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহের বিনিময়ে। সে সভ্যতা ভাল কি খারাপ তার বিচার আজ আর এখানে করব না।

বাঙালী আরও হারিয়েছে তার স্বয়ম্ভরতা

বেশিদিন আগের কথা নয়। মাত্র দুশো বছর আগেও বাঙলাকে 'সোনার বাঙলা' বলা হত। তার কারণ, বাঙলাই ছিল ধনোৎপাদনের উৎস। কৃষিপ্রধান দেশের অর্থনীতিতে বাঙলাই ছিল প্রথম। খনিজ পদার্থ উৎপাদনেও বাঙলার ছিল সেই ভূমিকা। নিত্যপ্রয়োজনীয় নানারকম শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনেও বাঙলা ছিল তাই। এক কথায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি ছিল স্বয়ম্ভর। অর্থনৈতিক উৎপাদনে বাঙালির ছিল একাধিপত্য।

কালের আবর্তনে বাঙালির আজ আর সেই গৌরবময় অধিকার নেই। এমনকি নিত্য আবশ্যকীয় পণ্যের জন্য বাঙালি আজ পরমুখাপেক্ষী।

বিগত দুশো বছরের মধ্যে ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে বাঙালি ক্রমশ হটে গিয়েছে রাজস্থানীদের ও বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের আগমনে। তারাই আজ বাঙলার ধনোৎপাদন ক্ষেত্রের মহাপ্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুশো বছর আগে বাঙলাকে যে 'সোনার বাঙলা' বলা হত তার কারণ ধনোৎপাদনে বাঙলাই ছিল ভারতে অদ্বিতীয়। নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাঙলা নিজের ভৌগোলিক গন্ডির মধ্যেই উৎপন্ন করত। নিজের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাঙলা উদ্বৃত্ত সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করত। এ পরিস্থিতিটা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বলবৎ ছিল। চিনি, মশলা সরিষার তৈল, কাপড় ইত্যাদিতে বাঙলা স্বয়ম্ভর ছিল।

খ্রীস্ট-পূর্বকালের গ্রীস দেশীয় লেখক ইলিয়াস ও লুকেনের রচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে ধান চাষের দ্বিগুণ তুলার চাষ হত। খনার বচনেও আমরা এর সমর্থন পাই। সরিষার চাষও প্রাচীন বাঙলায় খুব ব্যাপকভাবে হত। এটা অবশ্য খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা অনাদিকাল থেকে বাঙালী সরিষার তৈলের সাহায্যেই রন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন করে আসছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর (খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী) 'রামচরিত' থেকে আমরা জানতে পারি যে বরেন্দ্র দেশে এলাচের চাষ খুব ব্যাপকভাবে হত। অনুরূপভাবে অন্যান্য যে সব পণ্যের চাষ হত,

তার অন্যতম ছিল আদা, লঙ্কা, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি। বাঙলাদেশে এই সকল মসলা জাতীয় পণ্যের ব্যাপক চাষের কথা শুধু যে সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত'-এ বলে গিয়েছেন তা নয়। তাঁর বহুপূর্বে টলেমি, 'পেরিপ্লাস'-এর নাবিক-গ্রন্থকার ও অন্যান্য বৈদেশিক লেখকরাও বলে গিয়েছেন। বিশেষভাবে রোম সাম্রাজ্যে বাঙলার লঙ্কার বিশেষ আদর ছিল, এবং এক সের লঙ্কার দাম ছিল ৩০ স্বর্ণ দিনার। বাঙলার মসলিন ও নলেন গুড় রোম সাম্রাজ্যে বিশেষ সমাদৃত হত। কালিদাসও তাঁর 'রঘুবংশ-এ বাঙলায় ইক্ষুচাষের ব্যাপকতার কথা বলেছেন।

॥ দুই ॥

বাঙলার এই আর্থিক ঋদ্ধি মধ্যযুগেও বজায় ছিল। বস্তুত বাঙলার আর্থিক ঋদ্ধিতে চমৎকৃত হয়ে মধ্যযুগের বৈদেশিক পর্যটকরা বাঙলা দেশকে 'ভূস্বর্গ' বলে অভিহিত করে গেছেন। সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্য থেকেও আমরা বাঙলার বিপুল বৈষয়িক ঐশ্বর্যের কথা জানতে পারি। বাঙলার আর্থিক সম্পদ প্রতিষ্ঠিত ছিল তার কৃষি ও শিল্পের ওপর। নদীমাতৃক বঙ্গভূমি উৎপন্ন করত প্রচুর পরিমাণ কৃষিজাত পণ্য। এই সকল কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল চাল, তুলা, ইক্ষু, তৈলবীজ, সুপারি, আদা, লঙ্কা ও নানাবিধ ফল। পরে পাট ও নীলের চাষও প্রভূত পরিমাণে হত। শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকত। কৃষিকে হীনকর্ম বলে কেউ মনে করত না। এমন কি ব্রাহ্মণরাও কৃষিকর্ম করতে লজ্জাবোধ করত না। সেকথা উয়ান চুয়াঙ বলে গেছেন। চণ্ডী-মঙ্গলের কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম লিখে গিয়েছেন যে, তাঁর সাতপুরুষ কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে ছিল কার্পাস ও রেশমজাত বস্ত্র। সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য বাঙলার প্রসিদ্ধি ছিল যুগ যুগ ধরে। দেশ-বিদেশে বাঙলার মসলিনের চাহিদা ছিল। এই জাতীয় বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে একটি ছোট নস্যাধারের মধ্যে বিশ গজ কাপড় ভরতি করা যেত। বাঙলার শর্করার প্রসিদ্ধিও সর্বত্র ছিল। চিনি তৈরির জন্য বাঙলার নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। সে চিনি সাদা ধবধবে হত। এ ছাড়া, বাঙলায় প্রস্তুত হত শঙ্খজাত নানারূপ পদার্থ, লৌহ, কাগজ, লাক্ষা, বারুদ ও বরফ।

বীরভূমের নানা স্হানে ছিল লৌহপিণ্ডের আকর। তা থেকে লৌহ ও ইস্পাত তৈরি হত। বীরভূমের যে সকল স্হানে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ছিল সেগুলি হচ্ছে দামরা, ময়সারা, দেওচা ও মহম্মদ নগর। এই সকল লোহা দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত কলকাতা ও কাসিমবাজারে কামান তৈরি হত। বলা বাহুল্য, এই লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য বীরভূমের কারিগরগণ নিজস্ব প্রণালী অবলম্বন করত। বরফ তৈরির জন্যও বাঙলার নিজস্ব প্রণালী ছিল।

কিন্তু আজকের পরিস্হিতি এর বিপরীত দাঁড়িয়েছে। এসব নিত্য-নৈমিত্তিক জিনিস আজ বাঙলাকে অন্যপ্রদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। ফলে দরিদ্র বাঙালীর (বাঙলার ৪৬ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে) অর্থ আজ অন্যপ্রদেশকে সমৃদ্ধ করছে!

কারখানা-শিল্প স্হাপনের পরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্দীপনায় যে কয়েকজন উদ্যোক্তা কর্মবীরের (যথা রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এন. সি. সরকার, করুণাকুমার কর, রত্নবন্ধু দত্ত, ফণিন্দ্রনাথ গুপ্ত, সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, হেমেন্দ্র দত্ত, আলামোহন দাস, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রণবীর চৌধুরী, অভিজিৎ সেন প্রমুখ) প্রয়াসে যে ক'টি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তা আজ বাঙালীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ছিনিয়ে নিয়েছে হয় রাষ্ট্র, নয়ত অবাঙালীরা। বাঙালির হাতে বড় কারবার যে নেই, তা নয়। তবে সেগুলো রাষ্ট্রের কর্ণধারদের আত্মীয়স্বজনের হাতে, নয়ত তাদের বেনামদারদের হাতে। এছাড়া, বাঙলার সমস্ত বড় শিল্প অবাঙালীদের হাতে—হয় আবাসিক বা অনাবাসিকদের হাতে। এসব প্রতিষ্ঠানে বাঙালীর মাত্র একটাই ভূমিকা আছে। সেটা হচ্ছে মজুর, করণিক বা শ্রমিকের ভূমিকা। ব্যবসাক্ষেত্রে অবশ্য কিছু বাঙালী এখনও টিকে আছে, তবে তারা অবাঙালীর প্রতিযোগিতায় ধুঁকছে। বস্তুত আর্থিক আঢ্যতার ক্ষেত্রে বাঙালী আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও আজ বাঙালির অধঃপতন লক্ষণীয়। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর দেশের ছেলেরা আজ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে বা অন্য প্রদেশে যাচ্ছে। কেন? বাঙালীর এ সম্বন্ধে চিন্তা করার দরকার।

॥ তিন ॥

বাঙালীকে একজন ‘আত্মঘাতী’ জাতি বলেছেন। বাঙালীর বসনের দিকে তাকালেও তাই মনে হয়। প্রাচীনারা অবশ্য এখনও শাড়ি পরেন ; কিন্তু নবীনাদের পাজামা, চুরিদার ও সালোয়ার পরার প্রবণতাই লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে পুরুষরা ধুতি পরিহার করে প্যান্ট ও হাফহাতা সার্ট পরছে। বাঙালীর নিজস্ব চটিজুতাও আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। তার স্হান অধিকার করেছে রবারের হাওয়াই স্লিপার। বস্তুত পোষাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে বাঙালী আজ এক বর্ণচোরা জাতে পরিণত হয়েছে। বাঙালীর যে এক নিজস্ব ঐতিহ্য ছিল ও বৈষয়িক জীবনে একদিন সে স্বয়ম্ভর ছিল, তা আমরা ভুলেই গিয়েছি। আমরা ক্রমশঃ এক জারজ সংস্কৃতি ও বৈষয়িক জীবনচর্যার দাস হয়ে পড়ছি।

নারী নির্যাতনে দেশ গেল ভরে

আজ পশ্চিমবঙ্গ গভীরভাবে এক কুৎসিত সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আমি নারী নিগ্রহের কথা বলছি। প্রতিদিনই খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দু-চারটে করে নারী নিগ্রহের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। খবরগুলো পড়লে মনে হবে যে সমস্যা ক্রমশ উৎকট থেকে উৎকটতর হচ্ছে। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু মশায় বিধানসভায় যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, তা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে নারী নিগ্রহ প্রতি বৎসর বেড়েই চলেছে। মাত্র নারী ধর্ষণ সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত পরিসংখ্যানগুলিই প্রথম বিবেচনা করা যাক। ১৯৯৩ সালের ৩ মার্চ ও ১৯৯৪ সালের ৩০ মার্চ তারিখে তিনি বিধানসভায় যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা থেকে প্রকাশ পায় যে ১৯৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৪৯৬টি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালে দাঁড়িয়েছিল ৫০৪, ১৯৯১ সালে ৬৬৩, ১৯৯২ সলে ৬৯২ ও ১৯৯৩ সালে ৭১২। ধর্ষিতা মেয়েদের মধ্যে আট নয় বছরের মেয়েও ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সংখ্যাঙ্কগুলো দিয়েছেন তা থেকে এ রাজ্যে এ কুৎসিত সমস্যার সার্বিক চিত্রটা পাওয়া যায় না। কেননা, প্রথম মেয়েরা বহুক্ষেত্রেই তাদের ওপর এই লজ্জাকর অত্যাচার প্রকাশ করতে চায় না। দ্বিতীয়ত, যারা প্রকাশ করতে চায়, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় সেগুলি বহুক্ষেত্রেই থানার খাতায় নথিভুক্ত হয় না। তৃতীয়ত, গ্রাম থেকে যেসব নিরক্ষর ও নিরীহ কুমারী মেয়ে কর্মসংস্থানের প্রয়াসে কলকাতায় আসে এবং পরে সর্বক্ষণের 'কাজের লোক' হিসাবে কর্মনিয়োগ পায়, তাদের মধ্যে অধিকাংশের সঙ্গেই, হয় নিয়োগকারী নিজে বা তার পরিবারস্থ কেউ না কেউ 'দাদা', 'বাবা' ইত্যাদি সংশয়শূন্য সম্পর্ক পাতিয়ে অবাধে তাদের ধর্ষণ করে। তারপর তারা যখন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে, তখন তারা লজ্জায় নিজেই আত্ম-ঘাতী হয়, আর তা নয় তো তাদের মেরে ফেলে আত্মহত্যার রূপ দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রেও পুলিশ 'প্রভাবের শিকার হয়ে নীরব থেকে যায়।'

॥ দুই ॥

পরিস্থিতিটা বুঝবার জন্য, গত কয়েকদিন খবরের কাগজে নারী নিগ্রহের যে সব খবর বেরিয়েছে, সেগুলো এখানে তুলে ধরছি। ৯ এপ্রিল ১৯৯৪ তারিখের কাগজে বেরিয়েছেঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং-এর ঘুটিয়ারী শরিফ এলাকার নারায়ণপুর গ্রাম থেকে চারজনের একটি দল একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার ওপর ধর্ষণ করেছে। মেয়েটির অবস্থা চরম দেখে তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ কারুকেই ধরেনি। ওই তারিখের কাগজে আবার পড়ি—বাঁকুড়ার সিমলিপাল থানার জামদহরা গ্রামে এক রমণীকে ধর্ষণ করার জন্য আদিবাসী সমাজ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 'গিরা' (মৃত্যুদণ্ড) ফতোয়া জারি করেছে। ১০ তারিখের কাগজে আরও পড়ি—দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের উত্তরপাড়া গ্রামে লক্ষ্মী সরদার নামে এক গৃহবধূকে খুন করা হয়েছে। আবার ওই দিনের কাগজে পড়ি যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার যাদবপুর থানার বিজয়পুর গ্রামে এক নয় বছরের মেয়ের শ্লীলতাহানি করেছে ওই স্থানের আদর্শ বিদ্যাপীঠের এক শিক্ষক। ওই দিনের কাগজে আরও পড়ি যে সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীটের নির্যাতিতা আলপনা ব্যানার্জীর উকিলকে আদালত চত্বরেই মারধর করা হয়েছে। ১২ তারিখের কাগজে পড়ি যে ডায়মণ্ডহারবার রোডে পুলিশ হানা দিয়ে দুই মধুচক্র থেকে ১৮ জোড়া নারীপুরুষকে আপত্তিকর অবস্থায় গ্রেপ্তার করেছে। ১৩ এপ্রিল তারিখের কাগজে পড়ি—বারাসাত থানার নবপল্লীর তারক রায় নামে এক ব্যক্তি তার স্ত্রী স্বপ্নাকে পাচার করবার চেষ্টা করেছে। ওই তারিখের কাগজেই পড়ি যে বারাসাত হাবরা থানার এক যুবক আট বছর বয়সের এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে। আবার ওই তারিখের কাগজে পড়ি যে এক 'কাজের লোক' দিল্লী থেকে লিলুয়ায় তার বাড়িতে পালিয়ে এসেছিল। তার মনিব তাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এলে ওই মেয়েটির এক আত্মীয় কর্তৃক ক্ষুরের আঘাতে নিহত হয়েছে। ১৭ তারিখের কাগজে পড়ি—স্ত্রী জুলি পালের ওপর অত্যাচার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এক অফিসার অভিযুক্ত হয়েছে। ওই তারিখের কাগজে পড়ি যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থানে চারটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ১৮ এপ্রিল তারিখের কাগজে পড়ি শিয়ালদা স্টেশনের ভেতর কর্তব্যরত কনস্টেবল এক গৃহবধূর

স্বামীর বুকের ওপর বন্দুক ঠেকিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। আবার ওই তারিখের কাগজে পড়ি—বারাসাতের নান্দনিক কোচিং সেণ্টার-এ স্বপন কর নামে এক শিক্ষক ওই কোচিং-এর এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে। ২০ তারিখের কাগজে পড়ি—মেদিনীপুরের ডেবরা থানার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ১৬ বছর বয়সের এক রোগিনীকে ওই কেন্দ্রের এক কর্মী ধর্ষণ করেছে। ২৩ তারিখের কাগজে পড়ি—বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার দু'জন পুলিশ কনস্টেবল এক বিবাহিতা রমণীকে ধর্ষণ করেছে। ২৬ তারিখের কাগজে পড়ি টিটাগড় থানার আলি হায়দার রোডে এক বিকলাঙ্গ কিশোরীকে বাড়িওয়ালা ধর্ষণ করেছে। ওই দিনের কাগজেই পড়ি যে শিলিগুড়িতে টাউন স্টেশন সংলগ্ন রেল কোয়াটারে প্রদীপ চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি মল্লিকা রায় নামে এক 'কাজের লোক'কে জোর করে ধর্ষণ করায় মেয়েটি অন্তস্বত্বা হওয়ায় লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে। ওই দিনের কাগজেই পড়ি—বীরভূম জেলার নানুর থানার বঙ্গছত্র গ্রামে এক বিবাহিতা মহিলাকে ৫ জন গণধর্ষণ করে। ২৮ জুন ১৯৯৪ তারিখের 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার পড়ি এক পিতা নিজ ঔরসজাত কন্যাকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে চলেছে। মানুষ যে পশুর চেয়েও অধম হয়েছে, এটাই তার প্রমাণ।

২৮ এপ্রিল ১৯৯৪ খবরে প্রকাশ বাঁকুড়ায় নারীধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে নারীনির্যাতন সম্পর্কে আদালতে বিচারের সংখ্যা ছিল ১৩২০। ১৯৯৩ সালে ওই সংখ্যা হয়েছিল ১৩৫১। আদালতে বধূহত্যার মামলা থেকে দেখা যাচ্ছে পণ নিয়ে পরিবারে অসন্তোষ, স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডাইনী বলে প্রচার করে বিবাহিতা বহু তরুণীকে খুন করা। পরবর্তী দিনসমূহের খবরগুলো আরও ভয়াবহ ও বীভৎস। সেজন্য সেগুলো আর এখানে উদ্ধৃত করলাম না।

॥ তিন ॥

বস্তুতঃ বাঙলাদেশে নারীর আজ কোন নিরাপত্তা নেই। যে কোন সময় তারা ধান্ধাবাজ পুরুষের শিকার হয়ে নিগৃহীত হতে পারে। এ.

সম্বন্ধে ২৩ মে ১৯৯৪ তারিখের এক সংবাদ হুবহু তুলে ধরছি—

"বনগাঁ, ২২ মে—চাকরি দেওয়ার নামে বিবাহিতা এক যুবতীকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গিয়ে কলকাতার নিষিদ্ধপল্লীতে বিক্রি করে দিয়েছেন এক ডাক্তার, ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার পল্লীশ্রী কলোনীতে। প্রায় দেড় মাস সোনাগাছির নিষিদ্ধপল্লীতে নরকবাস করে গত মঙ্গলবার কোন রকমে বাড়িতে পালিয়ে আসে ওই যুবতী অণিমা সরকার (১৮)। অণিমার অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতারক ওই ডাক্তার দুর্গা সরকারকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে ধৃত ডাক্তারকে জেল হাজতে রাখারও আদেশ দিয়েছে আদালত। এদিকে পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক দুর্গা সরকারের এ হেন কাণ্ড-কারখানায় পল্লীশ্রী কলোনির বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। বনগাঁ স্টেশনের রেলবাজারের কাছে পল্লীশ্রী কলোনিতে রবিবার গেলে দেখা যায়, এলাকায় চাপা ক্ষোভ রয়েছে ওই ডাক্তারের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ডাক্তারের বাড়ি চাকদহের বিষ্ণুপুরে। সেখানে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েও রয়েছে তার। অণিমা নিজেই এদিন জানায়, প্রায় মাস চারেক আগে বিয়ে হয় ওদের। স্বামী প্রদীপ সরকার লণ্ড্রিতে কাজ করতেন। বিয়ের পর আর্থিক টানাটানি দেখা যায়। স্বামীও নিখোঁজ হয়ে পড়ে। পাড়ার ডাক্তার দুর্গাবাবুই লোভ দেখায়, নার্সিং হোমে চাকরি করে দেবে বলে। বাড়িতে না জানিয়ে হঠাৎই গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ডাক্তারের সঙ্গে কলকাতায় চাকরির আশায় বেরিয়ে পড়ে অণিমা। ডাক্তারবাবুও তাকে না জানিয়ে হাজির করে সোনাগাছি অঞ্চলের একটি বাড়িতে। বাড়ির মালকিন মালতী ওরফে মিনু রায়ের কাছে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয় অণিমাকে। অণিমা 'জানতে পেরে প্রচুর কান্নাকাটি করে। এদিকে ডাক্তারকাকাও উধাও। শেষমেশ জোর করে পালাতে চেষ্টা করে। মিনু তাকে তখন মানিকতলার একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলে।' ১৭ মে কাকভোরে অণিমা পালিয়ে আসে ওই বাড়ি থেকে। স্থানীয় যুবকরা ঘটনা শুনে অণিমাকে মারুতি গাড়ি করে পৌঁছে দেয় বনগাঁর বাড়িতে। এদিকে বনগাঁ থানার পুলিশ এদিন জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবারই ধৃত ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে মিনুর ডেরায় হানা দেয় তারা। যদিও মিনুসহ দলবল তখন উধাও। এদিকে স্থানীয় রেলওয়ে স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যদেরও প্রচুর অভিযোগ ওই ডাক্তারের বিরুদ্ধে। তাঁদের অভিযোগ

অসৎ উদ্দেশ্যেই চেম্বার খুলেছেন ডাক্তার। মাদক এবং নারী ব্যবসা দুই-ই চলছে সমানে। পুলিশকে জানিয়েও লাভ হয়নি। ('আজকাল' ২৩ মে ১৯৯৪)।

আবার ২৪ জুন ১৯৯৪ তারিখের কাগজ পড়ি—জলপাইগুড়ি, ২৩ জুন—ওদলাবাড়ির ১৮ বছরের তরুণী মমতা মিন্দাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করা হয়েছিল মথুরায়। সম্প্রতি সে সেখান থেকে পালিয়ে আসে, প্রথমে কলকাতায় এবং পরে কামরূপ এক্সপ্রেসে ওদলাবাড়িতে। ঘটনার সূত্রপাত এপ্রিলে। প্রতিবেশী কানাই বিশ্বাস ও তার বন্ধু গোপাল সরকার মমতার দাদাকে মমতার জন্য বিয়ের পাত্র খুঁজে দেওয়ার কথা বলে। দাদা রাজি হওয়ায়, তারা মমতাকে নিয়ে বিহারে রওনা দেয়। আট দিন পর ফিরে জানায় মমতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এদিকে, মমতাকে বিহারের বদলে নিয়ে যাওয়া হয় মথুরায়। পাঁচ হাজার টাকায় প্রথমে তাকে বিক্রি করা হয় বণিক সিংয়ের কাছে। বণিক সিং আবার দশ হাজার টাকায় তাকে বিক্রি করে। মমতা ফিরে আসার পর সব ঘটনা জানাতে পেরে স্থানীয় মানুষ কানাই বিশ্বাসকে ধরে পিটুনি দিয়ে পুলিসের হাতে তুলে দেয়। অপর আড়কাঠিটি এখনও পলাতক।'

॥ চার ॥

নারী ধর্ষণই একমাত্র নারী নিগ্রহ নয়। নারীর শ্লীলতাহানি, বধূনিধন, পণ্য হিসাবে তাকে বিক্রি করা প্রভৃতি এর নানা রূপ আছে। সম্প্রতি সংঘটিত কলকাতার সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীটে আলপনাদেবীকে বিবস্ত্রা করে তার ওপর তিন চার ঘণ্টা ধরে যে অমানুষিক অত্যাচার ও তারাপুরে পুলিশ কর্তৃক মেয়েদের প্রকাশ্যে বিবস্ত্রা করাও নারী নিগ্রহের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এছাড়া আছে পণের কারণে বধূনিধন। এটাও একটা গুরুতর সামাজিক সমস্যা। ১৯৯৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে পরিসংখ্যান পরিবেশন করেছেন, তা থেকে প্রকাশ পায় যে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২, এই পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১৪০৪টা বধূনিধন ঘটেছিল এবং নিধনকারীরা প্রতিক্ষেত্রেই অব্যাহতি পেয়েছিল। কিসের জোরে তারা অব্যাহতি পেল, তার প্রকৃত কারণ, একমাত্র ভগবানই

জানেন। তিনি আরও বলেছেন যে উক্ত সময়কালের মধ্যে ৮৯৪টি 'ইভটিজিং'-ও ঘটেছিল, তবে সে সব ঘটনার পুলিশ তদন্তে কেন দেরি হচ্ছে, তা তিনি 'দেখবেন'।

আজ নারীনিগ্রহ সংক্রান্ত ব্যাপারে যেসব ঘটনা ঘটছে, তা অতি আদিম সমাজেও ঘটে না। আজ আমরা যে এক অতি বর্বর সমাজে বাস করছি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মশায় বলেছেন যে কেন পুলিশি তদন্তে দেরি হচ্ছে, তা তিনি 'দেখবেন'। সেটা তো সরকারি কর্তব্যই। তাঁর এই আশ্বাসবাণীর পিছনে নতুন কিছু নেই। কিন্তু এতদিন হয়নি কেন, সেটাই তো তাঁর জানাবার কথা।

ইতিমধ্যে সমস্যা এমনই উৎকটতর হয়ে উঠেছে যে আমাদের মা-বোনদের পথে ঘাটে বেরুনো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যজগতের কোথাও নারী আজকের মতো অসহায় ও নিরাপত্তাহীন হয়নি। অথচ যেটা বুঝতে পারছি না, সেটা হচ্ছে আজকের বুদ্ধিজীবী সমাজ এ সম্বন্ধে নীরব রয়েছেন কেন? কথায় কথায় তো তাঁরা পদযাত্রা থেকে শুরু করে ব্রিগেড গ্রাউন্ডে বিরাট সমাবেশের সঙ্গে সভা করেন। আজ তাঁরা নীরব কেন? আজ তাঁরা মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্য কোনও রূপ আগ্রহ, উদ্যম ও উদ্দীপনা দেখাচ্ছেন না কেন? প্রতি নারীই যে মাতৃরূপিণী ও শক্তিরূপিণী এটা কি তাঁরা ভুলে গেছেন?

অপর নারী যে নিজের মা-বোনের সামিল, সেটা আজকের বাঙালী সমাজের এক শ্রেণীর লোক সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে। অথচ আমাদের ছেলেবেলায় তো এটা ছিল না। মেয়েরা তখন অসূর্যম্পশ্যা ছিল বলে, সূর্যোদয়ের পূর্বেই গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরবে বলে, ভোর রাতেই একাকী বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলকাতার নির্জন রাজপথ দিয়ে পায়ে হেঁটে গঙ্গার ঘাটে যেত, এবং আবার গঙ্গাস্নান সেরে পায়ে হেঁটেই নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরত। কলকাতার রাতের নির্জন রাজপথ তখন তাদের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। আজ নারী সম্পর্কে মানুষের যে কুৎসিৎ মনোবৃত্তি ঘটেছে, তা সমাজতত্ত্ববিদগণের অনুশীলনের বিষয়বস্তু হতে পারে। শেষ খবরে জানা গেছে নারী ধর্ষণের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করা হচ্ছে কঠোরতম শাস্তির জন্য।

বাঙালীর দুর্গতি

নানা কারণে বাঙালী আজ খুবই কাহিল অবস্থায় এসে পেঁছেছে। অথচ একশো-দুশো বছর আগে পর্যন্ত আর্থিক জীবনে বাঙালী স্বয়ম্ভর ছিল। আজ তার নিত্য আবশ্যকীয় সব জিনিসই আসে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চাষবাস ও মজুরি থেকে যা সামান্য আয় করে, তার প্রায় সবটাই চলে যায় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ দুর্বল ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। বঙ্গাব্দ চোদ্দ শতকে বাঙালীর এ দুর্গতি তুঙ্গে উঠেছে।

নিঃস্ব বাঙালী যা-ও বা কিছু সামান্য সঞ্চয় করেছিল, তা বিগত শতাব্দীতে হারিয়েছে শতাব্দীর সূচনায় বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংক দেওলিয়া হওয়ার ফলে, ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তুলার খেলার সর্বাত্মক জুয়ার মত্ততায়, ১৯৪৭-৪৮ সালের ব্যাঙ্কিং সংকটে ও শেয়ার বাজারের হাতছানিতে। বর্তমানে সে আবার সর্বস্বান্ত হয়েছে 'চিট' ফান্ডের প্রকোপে।

চোদ্দ শতকের বাঙালী বেশি মার খেয়েছে শেয়ার বাজারে। শেয়ার বাজার থেকে পয়সা উপায় করতে হলে আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন মোটা পুঁজি ও ঝুঁকি নেবার অসীম ক্ষমতা। এ দুটোই বাঙালীর নেই। ফলে নিঃস্ব বাঙালী যতবার শেয়ার বাজার থেকে ফায়দা তুলতে চেয়েছে, ততবারই আঙুল পুড়িয়ে ঘরে ফিরেছে। শেয়ার বাজারের পাণ্ডাদের কায়দা-কানুনগুলোর সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এরূপই ঘটে। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের শেয়ার বাজারের পাণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সরকার ১৯৫৬ সাল থেকে শেয়ার বাজার নিজ নিয়ন্ত্রণে এনেছে। কিন্তু সরকার নিজেই শেয়ার বাজারের পাণ্ডাদের এসব কায়দা-কানুন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। ফলে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনলেও কোন ফল ফলে নি। পঞ্চাশের দশকে হরিদাস মুন্ড্রার ও নব্বইয়ের দশকে হর্ষদ মেহটার কেলেঙ্কারী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

॥ দুই ॥

চারদিকে যা দেখছি তাতে মনটা ভারী দমে যাচ্ছে। সবচেয়ে শোচনীয়

দৃশ্য যা দেখছি, তা হচ্ছে দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদের আত্মপ্রকাশ। মনে হচ্ছে, বুঝিবা এবার দেশটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগে এক ইংরেজের বলা এক উক্তি। উইনস্টন চার্চিল একবার বলেছিলেন, ভারত স্বাধীনতা পাবার যোগ্য স্তরে এখনও পেঁছায়নি। ভারতকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে ইংরেজ এদেশে আসবার আগে ভারতের যে অবস্থা ছিল, ভারত আবার সে অবস্থাতেই ফিরে যাবে। ভারত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তখন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনায়, আমরা চার্চিলের কথায় খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। চার্চিলকে আমরা অনেক কটু কথা বলেছিলাম। রুষ্ট হয়ে সেদিন আমরা চার্চিলের ওই উক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলাম।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। দেখলাম ভারতকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেই স্বাধীনতা দেওয়া হল। সুতরাং জন্মসূত্রেই স্বাধীন ভারত বিচ্ছিন্নতাবাদের ধ্বজা কাঁধে নিয়ে তার মহাযাত্রা শুরু করেছে।

স্বাধীনতার পর দেশে দেখলাম, দুরকম রাজ—ঠাণ্ডা রাজ, আর ডাণ্ডা রাজ। ঠাণ্ডা রাজের আমলেই দেখলাম দেশের সংহতিকে বিনষ্ট করে আবির্ভূত হতে লাগল ভাষাভিত্তিক রাজ্যসমূহ। আজ আবার ডাণ্ডা রাজের আমলেও দেখছি সেই একই প্রবণতা। দেশের সংহতি আজ নষ্ট হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকোপে। দেশের ঐক্য যে আজ বিপন্ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এতে ঘাবড়াচ্ছেন না দেশের জনগণমন-অধিনায়করা। তাঁরা বলছেন এটা বিশেষ কিছু নয়। নাচ-গানের সমারোহ করলেই দেশের সংহতি বজায় থাকবে। এরকম কথা আর একবার শুনেছিলাম, বিধান ডাক্তারের আমলে। তখন বনমহোৎসবকে তিনি রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন সাহানা দেবীর নাচের মাধ্যমে। এ যেন মনে হচ্ছে যে দেশের সব সমস্যারই মকরধ্বজ হচ্ছে নাচগানের অনুষ্ঠান করে হৈ হৈ করা। কেবল ভয় পাই, এটা না শেষ পর্যন্ত নটরাজের প্রলয় নাচনে গিয়ে দাঁড়ায়।

ইংরেজ আমলেই দেশের মধ্যে মোটামুটি একটা রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংরেজ আসবার আগে যে ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়নি, তা নয়। হয়েছিল, যেমন মৌর্য-সম্রাট অশোকের আমলে, গুপ্ত-সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে, পাল-সম্রাট ধর্মপালের আমলে ও মুঘল-সম্রাট আকবরের আমলে, কিন্তু সে সবই ভেস্তে গিয়ে-

ছিল। ইংরেজ আসবার আগে ভারতের ইতিহাস তো তার সাক্ষ্য দেয়। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তারক্তি, সিংহাসন লাভের জন্য পিতাপুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে মারামারি, কাটাকাটি, এটাই তো ছিল ভারত ইতিহাসের গতানুগতিক ধারা। আজ আবার সেই প্রবণতাই উৎকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে? এর কারণ কি?

কারণ একটাই। ভারত হল আপাত বৈষম্যের দেশ। এ বৈষম্য সর্বগ্রাসী ও নানারকম,—নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মগত, জীবনচর্যার বৈষম্য ইত্যাদি।

॥ তিন ॥

ভারতের কোন নৃতাত্ত্বিক ঐক্য নেই। মোটামুটি, পাঁচটা বিভিন্ন নর-গোষ্ঠীর লোক ভারতে বাস করে, যথা প্রটো-অস্ট্রালয়েড, নর্ডিক, মেডিটেরেনিয়ান, আলপীয়-দিনারিক ও মঙ্গোলয়েড। এই পাঁচ নরগোষ্ঠীর লোক ভারতের মহামিলনক্ষেত্রে এসে মিলেছে। এই পাঁচ নরগোষ্ঠীর লোক মোটামুটি ১০৩৫টা মাতৃভাষায় কথা বলে। এগুলো আর্য, দ্রাবিড় ও মুণ্ডারী ভাষাভুক্ত। এদের সকলেরই মধ্যে ফোনেটিকস্, এটিমোলজি, মরফোলজি, সিনট্যাক্স ও সেমাণ্টিক্স-এর পার্থক্য আছে। উত্তর ভারতে প্রচলিত বর্ণমালাসমূহের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বর্ণমালাসমূহের রূপগত বৈষম্যও লক্ষিত হয়।

এ বৈষম্য মাত্র নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত নয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ও। মূলগতভাবে সমাজের ন্যূনতম সংস্থা হচ্ছে পরিবার, এবং পরিবারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বিবাহ দ্বারা। কিন্তু ভারতে যত জাতি আছে তার চেয়ে বেশি বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। একের বিধির সঙ্গে অপরের মিল নেই। উত্তর ভারতে মামাতো পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হয় না। অথচ দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় এটাই হচ্ছে বাঞ্ছনীয় বিবাহ। সেখানে মামা-ভাগ্নীর মধ্যে বিবাহও বিধিসম্মত বিবাহ। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে বধূর সিঁথিতে সিঁদুর দানই বিবাহের মূল অনুষ্ঠান এবং এটাই সধবা রমণীর চিহ্ন, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে সিঁদুর দান প্রথা নেই। সেখানে কণ্ঠে তালিবন্ধন'ই বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান, এবং এটাই সধবা স্ত্রীলোকের চিহ্ন। আবার আদি-

বাসীদের মধ্যেও নানারকম বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রেও উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কোন সাদৃশ্য নেই। আবার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসীদের মধ্যে বিধবা শাশুড়ি ও বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত আছে। কেরলের নায়ারদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। বহুপতিক বিবাহ দক্ষিণ ভারতে টোডাদের মধ্যে ও হিমালয়ের পাদদেশস্থ অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। অন্যত্র কিন্তু তা নেই। আছে কোনও কোনও জায়গায় দেবরণ প্রথা। তাছাড়া, বিবাহে মাঙ্গলিক আচার (যাকে আমরা স্ত্রী-আচার বলি) তা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অশন-বসনের বিচিত্রতাও আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালীর অনৈক্য। বাঙলা, আসাম ওড়িশা ও পূর্ব-উপকূলের প্রধান খাদ্য চাউল। চাউল সিদ্ধ করে খাওয়া হয়। উত্তর ভারত, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও অন্যত্র প্রধান খাদ্য গম। গম চূর্ণ করে জল দিয়ে মেখে রুটি তৈরি করে সেঁকে খাওয়া হয়। আবার পশ্চিম উপকূলস্থ অনেক জাতির প্রধান খাদ্য বজরা ও রাগি। বাঙলা, আসাম ওড়িশা ও আরও দু এক প্রদেশের লোকরা মাছ খায়। অন্যত্র মাছ খায় না, কিন্তু মাংস খায়। প্রাচ্য প্রদেশের লোকরা সরিষার তৈল দিয়ে রন্ধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে। উত্তরপ্রদেদের লোকরা কিন্তু ঘি ব্যবহার করে। রন্ধনক্রিয়ায় পশ্চিম ভারতের লোকরা তিলের তেল ও দক্ষিণ ভারতের লোকরা নারিকেল তেল ব্যবহার করে। মাত্র খাদ্যের দিক দিয়ে নয়, বসন-ভূষণের দিক দিয়েও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এক বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। পশ্চিম বাঙলার মেয়েরা (বিধবা ছাড়া) পাড়-বিশিষ্ট শাড়ি পরত। বিহার ও উত্তর প্রদেশের মেয়েরাও তাই। তার মানে তারা সেলাইবিহীন বস্ত্র ব্যবহার করত। কিন্তু রাজস্থান ও পাঞ্জাবের মেয়েরা সেলাইবিশিষ্ট বসন পরে। রাজস্থানের মেয়েরা বর্ণাঢ্য ঘাঘরা পরে। পাঞ্জাবের মেয়েরা পাজামা ও কামিজ পরে। পশ্চিম ভারতের মেয়েরা কাছা দেয়। অন্য জায়গার মেয়েরা কাছা দেয় না। পুরুষদেরও ধুতি নানা জায়গায় নানা কায়দায় পরা হয়। বাঙলায় চটি-জুতা ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের লোকরা গোড়ালি-বিশিষ্ট জুতা পরত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতের লোকের সামাজিক ও জীবনযাত্রা প্রণালীর কোনও একতা নেই।

ভারতের লোকের ধর্মীয় একতাও নেই। দুর্গাপূজা, দশেরা, দেওয়ালী, হোলি প্রভৃতি উৎসবগুলিকে আমরা জাতীয় উৎসব বলি। কিন্তু এসব উৎসব পালনের সময়কাল ও মর্যাদার দিক দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য হয়। বাঙলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। কিন্তু সংলগ্ন বিহার প্রদেশে তা নয়। সেখানে কার্তিকী ষষ্ঠীতে অনুষ্ঠিত 'ছট' পরবই বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব। উত্তর ভারতে বোধ হয় 'হোলি' ও পশ্চিম ভারতে 'দেওয়ালী'ই শ্রেষ্ঠ উৎসব। এ তো গেল সমষ্টির ব্যাপার। ব্যক্তির দিক থেকেও ধর্মীয় বিভেদ অসাধারণ। কেউ বৈষ্ণব, কেউ সৌর, কেউ গাণপতা, কেউ শৈব, কেউ শাক্ত, কেউ তান্ত্রিক, কেউ আস্তিক, কেউ নাস্তিক ইত্যাদি। আবার এসব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অসংখ্য সম্প্রদায় আছে।

এক কথায় সর্ব বিষয়েই ভারত এই আপাত বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার সুরে বাঁধা। সুতরাং আজ যদি ভারতে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা প্রকাশ পায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

॥ চার ॥

কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হলে কি হবে? কলকাতায় বাঙালী আজ পরবাসী। কেননা, কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বাসস্থানেরও অভাব ঘটছে। শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যখন কিছুকাল আগে এক রাজস্হানী ভদ্রলোক দাবি করেছিলেন যে রাজস্থানের সবচেয়ে বড় শহর হচ্ছে কলকাতা। কথাটার মানে বুঝলাম যখন উনি ওর ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, রাজস্হানেরও অনেক শহর আছে, কিন্তু সেসব শহরের কোনটাতেই এত রাজস্হানী বাস করে না, যত বাস করে কলকাতায়। যে হারে ইদানীং কলকাতায় রাজস্হানীদের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে এরকম উক্তিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু বাঙালীর এই শোচনীয় অবস্হার জন্য দায়ী কে? বাঙালী নিজেই। বাঙালীর উদাসীনতাই এর জন্য দায়ী। আজ এসব সমস্যার দিকে তাকাবার বাঙালীর সময় নেই! না আছে তার উদ্যম-উৎসাহ, না আছে সংগ্রামী মন। বাঙালী যে এসব গুণের অধিকারী নয়, তা বলছি না। কিন্তু তার সমস্ত উদ্যম-উৎসাহ ও সংগ্রামী মন আজ চলছে বিপথে। তার উদ্যম-উৎসাহ ও সংগ্রামী মন আজ আত্মকলহে নিয়োজিত। মাত্র এক দলের

সঙ্গে অপর দলের কলহ নয়। নিজ দলের মধ্যেই মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। তাছাড়া আছে অপর দলের প্রতি আগ্রাসন, আঘাত ও অঘটন। এসব দেখে মনটা প্রায়ই খারাপ হয়ে যায়। অনেক সময়ই মনে হয় যে কলহ, মারামারি, কাটাকাটি করেই বুঝি বাঙালী জাতটা খতম হয়ে যাবে। বাঙালীর মত এক প্রতিভাশালী জাতির যে এ-রকম দুর্দশা হতে পারে, তা অকল্পনীয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ জাতটা সারা ভারতে প্রতিভাশালী জাতি বলে পরিচিত ছিল। বাঙালী জাতির এ পরিচিতিটা ছিল উত্তর ভারতের মানুষের বনামে। এর কারণ নৃতাত্ত্বিক। সেটা আমি আলোচনা করেছি আমার 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে। সেজন্য তার পুনরাবৃত্তি আর এখানে করব না। মাত্র কিছু ঐতিহাসিক তথ্য এখানে দেব। নর্ডিক আর্যরা যখন পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বৈদিক সভ্যতার পত্তন করেছিল, তখন থেকেই তারা দুচক্ষে দেখতে পারত না আর্যভাষাভাষী আলপীয় বাঙালীদের। বাঙালীদের তারা ঘৃণা করত। তারা বাঙালীদের নাম দিয়েছিল 'বয়াংসি'। ঈর্ষার বশীভূত হয়েই তারা এটা করেছিল। ঈর্ষার কারণ, বাঙালীর শৌর্যবীর্য, শিক্ষা-দীক্ষা, উন্নত জীবনচর্যা, উচ্চতর ধর্ম ও ধর্মস্হান। তবুও বৈদিক আর্যদের মধ্যে যারা উদারমনা ছিল, তারা গোপনে বাঙলায় আসত তীর্থযাত্রা করতে। তবে এর জন্য তাদের শাস্তি পেতে হত প্রায়শ্চিত্ত করে। তারপর বৈদিক আর্যরা যখন সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করল, তখন তারা ধাক্কা খেল বাঙালী ও প্রাচ্যদেশের লোকদের কাছে। বহুদিন তাদের বিদেহ পর্যন্ত এসে অথর্ব হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। এই বাঙালী ও প্রাচ্য দেশের লোকদের শৌর্যবীর্যের কথা শুনেই দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ফিরে গিয়েছিল বিপাশা নদীর পশ্চিম তীর থেকে। পরবর্তীকালে আর্যরা যখন দলে দলে বাঙলায় এল, তখন তাদের ভুলে যেতে হয়েছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠ দেবতাদের (যথা ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি), এবং তারা পুজা করতে আরম্ভ করেছিল বাঙলার দেবদেবীদের। তাদের নিয়েই রচিত হল পুরাণসমূহ। বৈদিক ধর্মের পরিবর্তে পৌরাণিক ধর্মেরই জয়জয়কার হল। এমন কি সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। বাঙালী কাব্য-রচনায় যে নতুন রীতি উদ্ভাবন করল, তা 'গৌড়ীয়' রীতি নামে আখ্যাত হল। সেই রীতিতেই

জয়দেব রচনা করলেন, তাঁর অমর গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ'।

মুসলিম আমলে আরও যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটল। যেসব দেবদেবী ঝোপজঙ্গলে বা পর্বতকন্দরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা প্রতিষ্ঠা পেলেন হিন্দুসমাজে। বাঙালী নিজ প্রতিভা বিকশিত করল এক সমৃদ্ধশালী সাহিত্য রচনা করে—চর্যাগীতি, পদাবলী ও অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যের জীবন-চরিতে। বাঙালী সে প্রতিভা আরও বিকশিত করল নানারূপ স্মৃতিগ্রন্থ রচনায়। ভবদেব, জীমূত-বাহন, রঘুনন্দন প্রমুখেরা নতুন নতুন বিধানগ্রন্থ রচনা করলেন। তারপর ইংরেজ আমলে বাঙালী কর্মকার পঞ্চাননের সহায়তায় চার্লস উইলকিনস নির্মাণ করল বাংলা হরফ। তার ফলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল শিক্ষা ও সাহিত্য প্রসারের ক্ষেত্রে। এক নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল, যারা উত্তর ভারতের স্কুল কলেজে নিযুক্ত হয়ে উত্তর ভারতকে শিক্ষিত করে তুলল। এই শিক্ষিত সমাজই নেতৃত্ব গ্রহণ করল স্বাধীনতা আন্দোলনের, যে আন্দোলনের পরিণতিতে ভারত থেকে ইংরেজের মহা-প্রস্থান ঘটল। বাঙালীর এই প্রতিভা দেখেই গোখলে উদাত্তকণ্ঠে বলেছিলেন—'হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টুডে, ইণ্ডিয়া থিংকস্ টুমরো।'

কিন্তু আজ সেই প্রতিভাশালী বাঙালী জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই হটে যাচ্ছে। একটা প্রতিভাশালী জাতির আজ যে শোচনীয় অবনতি ঘটছে, তা সত্যিই খুব দুঃখের বিষয়। এর একমাত্র কারণ বাঙালী আজ আত্মকলহে প্রমত্ত হয়ে অগ্রগতির সুযোগ ও সুবিধা করে দিচ্ছে অপরকে। এ আত্মকলহ আজ এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যে পরস্পর পরস্পরকে গালিগালাজ দেওয়াটাই প্রতিভার একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এক সময় বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল না। বঙ্কিমের কথাই ধরা যাক। বঙ্কিম বলেছিলেন—'সকলেরই বিশ্বাস বাঙালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। যে বলে চিরকাল বাঙালীর এই চরিত্র, চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।' বাঙালী কি এখনও আত্মকলহের বলি হয়ে থাকবে? আত্মকলহ বিলোপ করে, সে আজ আত্মবিক্রম প্রকাশ করুক, এটাই হোক আজকের বাঙালীর সাধনা। কবিগুরুর সঙ্গে সে বলে উঠুক —'উর্থলি যখন উঠেছে বাসনা / জগতে তখন কিসের ডর।'

•

——

ঘটনাপঞ্জী

খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১৮৯৩	স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা।
১৮৯৩	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৬	কলকাতায় ভূমিকম্প।
১৮৯৭	বুয়ার যুদ্ধ ও চাউলের দাম বৃদ্ধি।
১৮৯৮	প্লেগ মহামারী।
১৯০০	কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন গঠিত।
১৯০১	মহারানী ভিকটোরিয়ার মৃত্যু।
১৯০২	স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু।
১৯০২	কলকাতায় ইলেকট্রিক ট্রাম প্রবর্তন।
১৯০৫	বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত। প্রতিক্রিয়ায় বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন।
১৯০৫	অনুশীলন সমিতি গঠন।
১৯০৭	বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার ফলে বহু বাঙালীর সর্বনাশ।
১৯০৯	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আইন কলেজ স্থাপন।
১৯১১	মোহনবাগান কর্তৃক I. F. A. Shield জয়।
১৯১১	দিল্লীর দরবার। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত। বঙ্গভঙ্গ নাকচ।
১৯১২	শহর উন্নয়নের জন্য ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট গঠিত। তুলার খেলার পদাঙ্কে জুয়ার প্লাবন।
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি।
১৯১৪-১৮	প্রথম মহাযুদ্ধ।
১৯১৬	জার্মান ডুবো জাহাজ 'এমডেন'-এর বঙ্গোপসাগরে হানা, মাদ্রাজে বোমা বর্ষণ ও সুন্দরবনের দিকে অগ্রসর।
১৯১৬	স্যাডলার কমিশন।
১৯১৮	জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড ; প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ।
১৯১৮	ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী।
১৯১৮	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

১৯১৯ কলকাতায় প্রথম বিমান অবতরন।

১৯২০ কলকাতায় রিকশার প্রবর্তন।

১৯২১ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন।

১৯২২ চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক স্বরাজ্য পার্টি গঠন।

১৯২২ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কার।

১৯২৪ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

১৯২৪ কলকাতায় বাস প্রবর্তন।

১৯২৫ চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু।

১৯২৬ কলকাতায় ক্রিকেট খেলার জন্য বিলাতের M. C. C. ক্লাবের আগমন।

১৯২৫ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

১৯২৬ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।

১৯২৮ কলকাতায় বেতার প্রবর্তন।

১৯৩০ আইন অমান্য আন্দোলন।

১৯৩০ সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

১৯৩১ সিমপসন হত্যা ও বিনয়-বাদল দীনেশের সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিং-এ 'অলিন্দ যুদ্ধ'।

১৯৩৪ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হন।

১৯৩৪ সূর্যসেনের মৃত্যু। কলকাতায় ঝিনঝিনিয়া রোগের প্রকোপ।

১৯৩৪ বিহার ভূমিকম্প ও কলকাতায় তার তীব্র অনুভূতি।

১৯৩৬ অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো স্থাপন।

১৯৩৮ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

১৯৩৯-৪৫ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

১৯৪১ সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান।

১৯৪১ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু

১৯৪২ আগস্ট বিপ্লব ও মেদিনীপুরে বিকল্প সরকার গঠন।

১৯৪৩ নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্তৃক আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন।

১৯৪৩ কলকাতার রাজপথে হাজার হাজার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারীর মৃত্যু।

১৯৪৩ তেভাগা আন্দোলন।

১৯৪৩ কলকাতায় জাপানী বোমারুর আক্রমন।

১৯৪৪ রেশনিং প্রথা প্রবর্তিত।

১৯৪৬-৪৭ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা।

১৯৪৭ স্বাধীনতা লাভ ও বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়া।

১৯৪৭ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'জনসংঘ' দল গঠন।

১৯৪৭	শেয়ার বাজারে মূল্যপতন হেতু বহু ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়া ও বাঙালীর সর্বনাশ।
১৯৫১	ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা।
১৯৫২	মধ্যশিক্ষা পর্ষদ স্থাপিত।
১৯৫২	এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির ফলে ধুন্ধুমার কাণ্ড।
১৯৫২	রেশনিং প্রথার অবলুপ্তি।
১৯৫৩	শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।
১৯৫৩	সালে তেনজিং নোরগে ও এডমণ্ড হিলারি কর্তৃক এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয়।
১৯৫৭	সোভিয়েট নেতাদ্বয় বুলগেনিন ও ক্রুশ্চেভের ভারত সফর।
১৯৫৮	ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের ভারত সফর।
১৯৬২	ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু।
১৯৬৪	রেশনিং প্রথার পুনঃ প্রবর্তন।
১৯৬৭	অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত।
১৯৬৯	বামফ্রন্ট সরকার গঠিত।
১৯৬৯	চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশাল আন্দোলন।
১৯৭১	স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত বাংলাদেশ থেকে ৭৫ লক্ষ শরনার্থীর ভারতে প্রবেশ।
১৯৭২	চারু মজুমদারের মৃত্যু।
১৯৭৭	জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রণ্ট সরকার।
১৯৭৬	নজরুল ইসলামের মৃত্যু।
১৯৭৭	কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র স্থাপিত।
১৯৮২	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি গঠিত।
১৯৮৪	ভূপালে গ্যাস দুর্ঘটনায় ২০০০ নিহত।
১৯৮৫	'নন্দন' প্রতিষ্ঠা।
১৯৮৬	পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি প্রতিষ্ঠা।
১৯৮৭	পঃ বঃ নাট্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠা।
১৯৮৭	সত্যজিত রায়ের **Legion D' Honour** প্রাপ্তি।
১৯৯২	সত্যজিত রায়ের **OSCAR** প্রাপ্তি।
১৯৯৩	দ্বিতীয় হাওড়া সেতুর উদ্বোধন।
১৯৯৪	শতাব্দীর সমাপ্তি।
১৯৯৪	সুস্মিতা সেনের 'বিশ্বসুন্দরী' খেতাব প্রাপ্তি।

———